"বিশেষ করে গঙ্গাই হল ভারতের নিজের নদী। এখানকার লোকরা তাকে ভালোবাসে ; তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের জাতীয় স্মৃতি, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আমাদের জয়গান, আমাদের সাফল্য ও পরাজয়। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতীক্ হল এই গঙ্গা নদী। চির-পরিবর্তনশীল, চির-প্রবাহিতা, কিন্তু সেই এক। ভারতের অতীতকালের স্মৃতি-চিহ্ন এই গঙ্গা, বর্তমানের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ভবিষ্যতের বিশাল সাগরের অভিমুখে।"

জওহরলাল নেহরু

নেহরু বাল পুস্তকালয়

(প্রথম খণ্ড)

লেখা : লীলা মজুমদার

ছবি : তাপস দত্ত

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

গঙ্গার অবতরণ

গঙ্গানদী কেমন করে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমেছিল, তার গল্প বড় চমৎকার।

সেকালে সগর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর যেমন বিপুল ধন-সম্পত্তি, তেমন প্রবল প্রতিপত্তি। কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না; কেবলই আরো নিতে, আরো পেতে চাইতেন। শেষকালে তিনি খুব জাঁক-জমক করে অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

যজ্ঞের এই নিয়ম ছিল যে খুব ভালো একটা ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হত। ঘোড়া ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াত, তবে সঙ্গে রক্ষী থাকত। কেউ যদি ঘোড়াটাকে বাধা দিত, কিম্বা ধরতে চেষ্টা করত, ঘোড়ার রক্ষীদের সঙ্গে তাকে যুদ্ধ করতে হত।

সকলে বলত এই যজ্ঞ যে করবে সে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হবে। সগর রাজা যেই তাঁর যজ্ঞের আয়োজন শুরু করলেন, স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের হল বেজায় ভয়। শেষটা সগর তাঁকে সুদ্ধ স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে, রাজ্য কেড়ে নেবে না তো!

ইন্দ্র ঠিক করলেন যেমন করে হোক, এ যজ্ঞ বন্ধ করতে হবে। লুকিয়ে তিনি ঘোড়াটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে, সমুদ্রের ধারে কপিলমুনির আশ্রমের পিছনে বেঁধে রেখে দিলেন। এই জায়গাটাকে এখন লোকে গঙ্গাসাগর বলে; এইখানে গঙ্গানদী সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে। যুগযুগান্ত ধরে তীর্থযাত্রীরা এখানে স্নান করতে আসে। আজ পর্যন্ত পৌষ মাসের শেষে এখানে গঙ্গাসাগরের মেলা বসে।

এদিকে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে ঘোড়া খুঁজে হয়রান। শেষ পর্যন্ত কপিলমুনির আশ্রমের পিছনে ঘোড়া পাওয়া গেল। রাজপুত্ররা

ভাবলেন মুনি-ই নিশ্চয় ঘোড়া ধরে বেঁধে রেখেছেন। সে সময়ে কপিল-মুনি গভীর ধ্যানে মগ্ন। কোনো দিকে খেয়াল নেই। রাজপুত্রদের কর্কশ গলার আওয়াজে তাঁর ধ্যান ভাঙ্গল। তাঁরা চিৎকার করে মুনিকে নানা রকম ভাবে অপমান করতে লাগলেন। মুনি চোখ খুললেন। হতভাগ্য রাজ-পুত্রদের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়তেই, তখনি তাঁরা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন।

নারদমুনি সগরের কাছে দুঃসংবাদ নিয়ে গেলেন। সগর শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কি করা যায়? সগরের নাতি অংশুমান তখন কপিলের আশ্রমে ছুটে গিয়ে, মুনির পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। মুনির রাগ জল হয়ে গেল। তিনি অংশুমানকে দুটি বর চাইতে বললেন।

অংশুমান প্রথম বর চাইলেন ঘোড়াটাকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বর চাইলেন ষাট হাজার রাজপুত্র যেন ফিরে আসেন।

কপিল তখনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু এ-ও বললেন যে রাজপুত্রদের ফিরবার সময় হয় নি। যখন সময় হবে, তখন অংশুমানের নাতি ব্রহ্মার তপস্যা করে, তাঁকে খুসি করবে। ব্রহ্মা তখন তাঁর কমণ্ডলুর মধ্যে থেকে বন্দিনী গঙ্গাকে বের করে দেবেন। অংশুমানের নাতি সেই স্রোত নিয়ে যাবে যেখানে সগরের ছেলেদের ছাই পড়ে আছে, সেখানে। যেই গঙ্গার পবিত্র স্রোত সেই ছাইয়ের উপর দিয়ে বয়ে যাবে, অমনি সগরের ষাট হাজার ছেলে মুক্তি পেয়ে, স্বর্গে গিয়ে তাদের পুরস্কার পাবে। হলও ঠিক তাই। এদিকে যজ্ঞ শেষ করে সগররাজা তাঁর নাতি অংশুমানের হাতে রাজ্য দিয়ে, তপস্যা করতে বনে গেলেন। অংশুমানের পর, তাঁর ছেলে দিলীপ রাজা হয়েছিলেন। দিলীপ ব্রহ্মাকে তুষ্ট করতে অনেক চেষ্টা করে-ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। দিলীপের পর ভগীরথ রাজা হলেন।

আগেকার সব চেষ্টা বিফল হওয়া সত্ত্বেও ভগীরথ পণ করলেন যে তার হতভাগ্য পূর্বপুরুষদের দুর্দশা না ঘুচিয়ে তিনি ছাড়বেন না। বাড়িঘর ছেড়ে বরফে ঢাকা হিমালয়ে গিয়ে তিনি এক মনে এমনি তপস্যা করলেন যে শেষ পর্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মা গঙ্গাকে তাঁর কমণ্ডলু থেকে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু এখানেই সমস্যার শেষ হল না। গঙ্গার উদ্দাম জলের রাশি ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে এমন প্রচণ্ড বেগে নামতে লাগল যে শিব যদি দয়া

করে, তাঁর মাথার জটায় সেই প্রবল স্রোত ধারণ না করতেন, তা হলে সমস্ত সৃষ্টি তখনি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। গঙ্গা এবার শিবের জটায় বন্দিনী হলেন।

ভগীরথও ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনি এবার শিবের স্তব-স্তুতি সাধ্য-সাধনা করতে লাগলেন। শিব খুসি হয়ে গঙ্গাকে মুক্তি দিলেন।

ঝরণার ধারার মতো ঝর-ঝর কল-কল করে গঙ্গার স্রোত নেমে এল। ভগীরথ আগে আগে তাঁর বিশাল শাঁখ বাজাতে বাজাতে পূব দিকে চলতে লাগলেন। তাঁর পিছন পিছন ঢেউ তুলে, আনন্দে নেচে নেচে, পাহাড়ের গা বেয়ে গঙ্গা নামতে লাগলেন।

সামনে আরো বিপদ। এক জায়গায়, পথের ঠিক মাঝখানে জহ্নু-মুনি পূজায় বসেছিলেন। গঙ্গার উদ্দাম স্রোতে, নিমেষের মধ্যে তাঁর পূজার উপকরণ ও বাসন-পত্র ভেসে গেল। মুনি বেজায় রেগে গেলেন। এক চুমুকে গঙ্গার সব জল পান করে, তবে তিনি থামলেন। এক ফোঁটাও বাকি রইল না। ভগীরথের চক্ষু-স্থির !

কিন্তু কি আর করেন তিনি ? মুনির পায়ে পড়ে অনুনয়-বিনয় স্তব-স্তুতি ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তাই দেখে আস্তে আস্তে মুনির রাগ পড়ল। তিনি নিজের জানু থেকে গঙ্গার জল আবার বের করে দিলেন। তাই গঙ্গার আরেক নাম জাহ্নবী।

অবশেষে গঙ্গাকে নিয়ে ভগীরথ সমুদ্র-তীরে পৌঁছলেন। গঙ্গা তখন সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পাতালে প্রবেশ করলেন। পাতালে নেমে সগর-রাজার ষাট হাজার ছেলের ছাইয়ের উপর দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হলেন। তারা মুক্তি পেল।

উঁচু পাহাড়ের উপরে যারা ভ্রমণ করে, তারা অনেক অতি আশ্চর্য ও অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখতে পায়। বিশাল হিমালয় পর্বতের অনেক উপরে, একটা নির্জন জায়গা আছে। সেখানে গেলে মনে হয় পাহাড়গুলো যেন সরে দাঁড়িয়েছে। মাঝখানে প্রায় এক মাইল চওড়া একটা উপত্যকা তৈরি হয়েছে। তার চারদিকে বিশাল বিশাল পাহাড়ের চূড়ো ঠিক যেন

গঙ্গা সাগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য

আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে। তাদের নামগুলিই বা কি সুন্দর, ভৃগুপন্থ, শিবালিং মেরুপর্বত ইত্যাদি।

এখানে কেউ থাকে না। একটিও বড় গাছ নেই, পাখিও ডাকে না। তবে জল-হাওয়ার সুবিধা পেলে যেসব বলিষ্ঠ তীর্থযাত্রী এদিকে আসে, তারা মাঝে মাঝে ভালুকের পায়ের ছাপ দেখে চমকে ওঠে।

এখানে বেজায় শীত।

তবু তীর্থ-যাত্রীদের সে কি আগ্রহ। দেখে মনে হয় শীতের কষ্ট তারা এতটুকু টের পাচ্ছে না। একটার পর একটা পিছল পাথরে খুব সাবধানে পা রেখে, তারা বরফের উপর দিয়ে এগিয়ে যায়। চড়াই উঠতে গিয়ে তাদের হাঁপ ধরে যায়। একটু থেমে, দম নিয়ে, তারা আবার চলতে থাকে। তার পরে একটা বাঁক ঘুরে, আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে, তবে

তারা থামে। বিশাল কয়েকটা বরফের গুহার সামনে মাথা নিচু করে, দুই হাত জোড় করে, তারা দাঁড়িয়ে থাকে।

এই হল গোমুখ ; এইখানে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি। গোমুখ মানে গোরুর মুখ, কিম্বা পৃথিবীর মুখ। কারণ গো শব্দের আরেক মানে হল পৃথিবী। যে অন্ধকার গুহার ভিতর থেকে রাশি রাশি ঘোলা জল হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে, তার সঙ্গে বাস্তবিকই গোরুর মুখের সাদৃশ্য আছে। গুহাটা হল গোরুর মুখের হাঁ। বরফে তৈরি উপরের ঠোঁটটি তার উপরে ঝুলে রয়েছে আর পিছন দিকে দুটি উঁচু বরফের চূড়া এমন ভাবে বসানো যেন দুটি কান।

গুহাটা মস্ত বড় ; হয়তো তিনশো ফুট উঁচু আর একশো ফুট চওড়া। থেকে থেকে একেকটা প্রকাণ্ড বরফের চাংড়া গুহার কানা থেকে ভেঙে জলে পড়ছে। ঘোলা জলের স্রোত অমনি পাক খেতে খেতে, সেগুলোকে সঙ্গে করে উপত্যকার বালির উপর দিয়ে বেগে বয়ে যায়।

রোদ লেগে দুই পাশের পাহাড়ের বরফ গলতে থাকে। ছোট ছোট

গোমুখ
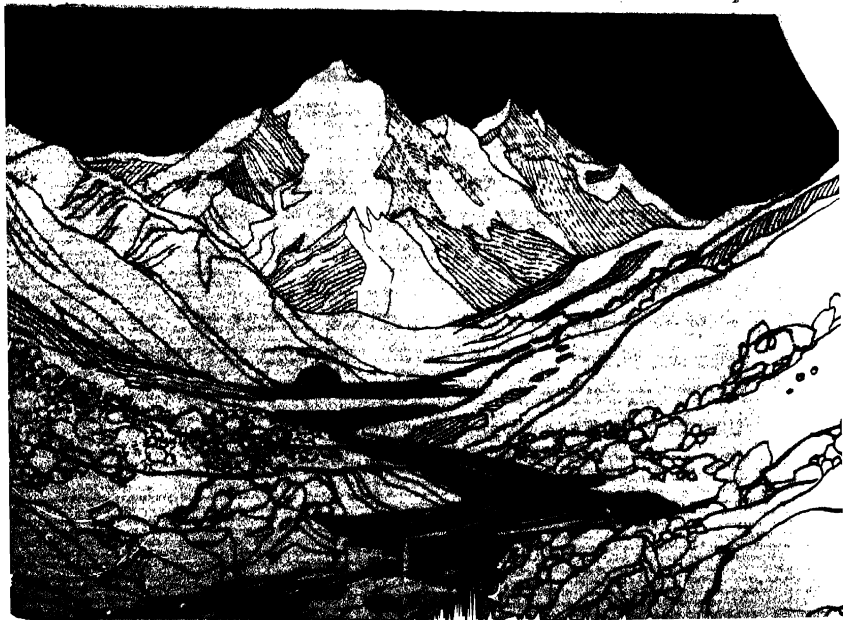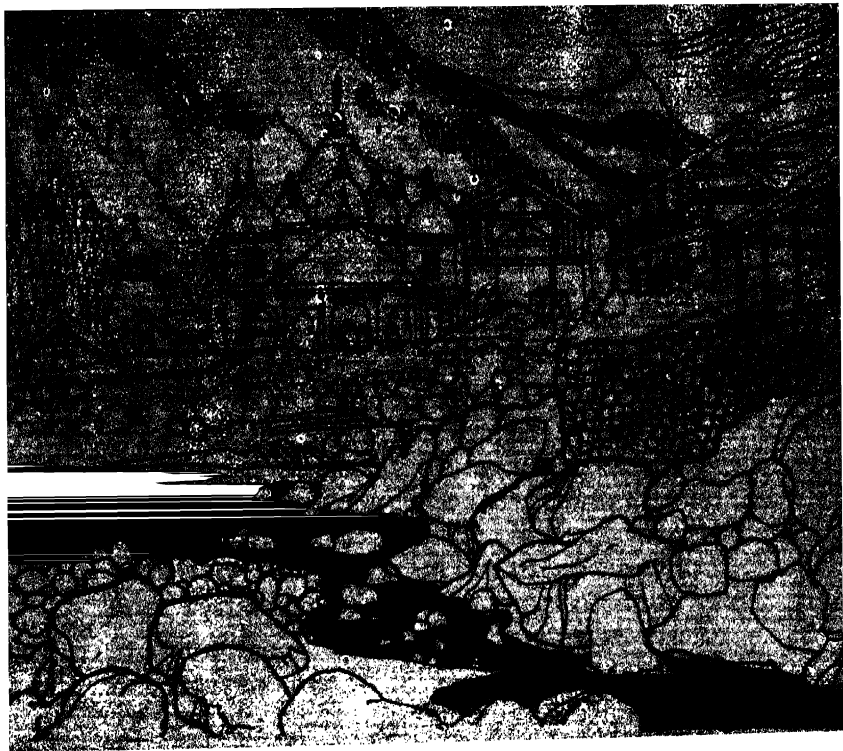
গঙ্গোত্রীর মন্দির

নদী তৈরি হয়। সে সব নদীর জলও ঝিকমিক করতে করতে গঙ্গায় গিয়ে পড়ে। এইভাবে গঙ্গার সরু ধারা ক্রমে আরো গভীর, আরো চওড়া হতে থাকে।

এমনি করে চীরবাসার চীর আর ভূর্জ গাছের বনের দিকে ছোট গঙ্গা নদী ছুটে চলে।

সেকালের লোকে বিশ্বাস করত হিমালয়ের চূড়োয় দেবতারা থাকেন। আর যেসব নদী পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে, তারা তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে আসে। তাই তারা বড় পবিত্র। আবার তাদের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হল গঙ্গা।

নদী সর্বদা নিচের দিকে বয়ে চলে। গোমুখ থেকে গঙ্গাও কেবলই

নেমে আসে। ওখান থেকে গঙ্গোত্রী আঠারো মাইল দূরে। পথ বড়ই নির্জন। কোথাও একটা বাড়ি বা দোকান ঘর চোখে পড়ে না। পথের ধারে নুড়ি আর পাথরের ছোট ছোট ঢিপি দেখে বুঝতে হয় যে এই পথে তীর্থযাত্রীরা গিয়েছে। পরে যারা আসে, তারাও ঐ ঢিপির উপরে নিজেদের নুড়ি রেখে যায়।

কোথাও ফোঁস ফোঁস শব্দ তুলে, কোথাও নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে গঙ্গোত্রীর পাশ দিয়ে নদী বয়ে যায়। গঙ্গোত্রী বলতে, জলের ধারে ছোট একটি তীর্থস্থান। নদীর খাতে ছোট বড় পাথর আর নুড়ি ছড়িয়ে আছে। তার উপর দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা ঘোলা জল ফেনা ছিটিয়ে, কল কল শব্দ করে ছুটে চলেছে। এর আগে অবধি চারদিকে ছিল রুক্ষ ন্যাড়া পাহাড়-জমি। বড় গাছপালা সেখানে হয় না। তার জায়গায় এখন দেখা যায় সুন্দর সুন্দর উঁচু গাছ।

এ জায়গাটা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 3000 মিটার উঁচুতে। এখানেও বড় ঠাণ্ডা। যতই গঙ্গা এগিয়ে চলেছে, দুই ধার থেকে অনেক উপনদীর জল এসে তার স্রোতে মিশে যাচ্ছে; নদীটা তাই আরো অনেক বেশী গভীর আর চওড়া হয়ে উঠছে। আর স্রোতের সে কি বেগ। দুই ধারে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে গঙ্গা বড় কষ্টে পথ করে নিয়ে বয়ে চলে। দুই পাশে এখন বিশাল বিশাল গাছ। কোথাও বা সরু গিরিখাতের ভিতর দিয়ে নদী বয়ে যায়। শত শত ছোট নদী কেবলই তার স্রোতে জল ঢালতে থাকে। ভীরু হরিণের পাল বনের মধ্যে থেকে উঁকি মারে। অপরূপ সব পাখি দেখা দেয়। কি মিষ্টি তাদের ডাক।

দেবপ্রয়াগে মন্দাকিনী আর অলকানন্দার মিলিত ধারা গঙ্গার সঙ্গে মেশে। মন্দাকিনী নদী উঠেছে বিখ্যাত কেদারনাথ তীর্থ স্থানের পাশে। অলকানন্দার উৎপত্তি বদ্রীনাথের কাছে। এ সব নদীর নাম শুনলেও কত লোকে ভক্তি ভরে নমস্কার করে। পাহাড় ছেড়ে গঙ্গা যখন হৃষিকেশ আর হরিদ্বারে পৌঁছয়, লোকে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশস্ত প্রসন্ন উজ্জ্বল রূপ দেখে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এই জায়গা দুটির পবিত্র স্থান বলে খ্যাতি আছে।

হরিদ্বার থেকে কয়েক মাইল দূরেই লছমনঝোলা। বড় সুন্দর জায়গা। এখানে পাথরের উপর দিয়ে গঙ্গার স্বচ্ছ শীতল স্রোত বয়ে চলেছে।

লছমনঝোলা

দলে দলে কালা মুখো হনুমান বসে বসে মিট মিট করে দেখে কে এল, সঙ্গে কি আনল। খাবারের মতো কিছু দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই, অমনি ছিনিয়ে নেবে। জলের মধ্যে প্রকাণ্ড বড় বড় মাছ সাঁতরে বেড়ায়। তাদের বেজায় সাহস। যে সব দিশী নৌকো চেপে যাত্রীরা নদী পার হয়, মাছগুলো তার দুই পাশে ভিড় করে আসে। এখানে মাছ ধরা বারণ, মাছরা তাই কারো তোয়াক্কা রাখে না। কে একজন লোক ছোট ছোট আটার গুলি জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল আর অমনি মস্ত মস্ত মাছগুলো ঐ খুদে এক গ্রাস পাবার লোভে সে কি ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি লাগিয়ে দিল।

এলাহাবাদ, বারাণসী, কলকাতার মতো গঙ্গাতীরের বড় বড় শহরে

যারা বাস করে, তারা কখনোই লছমনঝোলার বা হরিদ্বারের এই চঞ্চলা, চিকচিকে, কল হাসিনী নদীকে তাদের পরিচিত চওড়া, শান্ত, গভীর গঙ্গা বলে চিনতে পারবে না। এ নদী এখনো পাহাড়ে নদী। এর দুই তীরে বড় বড় গাছ। এর বুকে প্রকাণ্ড বড় বড় পাথরের চাঁই। সেই পাথর ঘিরে নদীর স্রোত যখন ফেনা উড়িয়ে, প্রবল বেগে ছুটে চলে, দেখে মনে হয় সে যেন আনন্দ রাখার জায়গা পাচ্ছে না।

যেমন হরিদ্বারে, তেমনি এলাহাবাদ, কাশী ও অন্যান্য জায়গাতেও, যুগ যুগ ধরে, গঙ্গার দুই তীরকে বড় পবিত্র তীর্থ স্থান বলে মনে করা হয়। বছরের মধ্যে কতবার নদীর ধারে নানান জায়গায় উৎসব ও স্নান যাত্রা হয়। তখন সেখানে ছোট বড় মেলা বসে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল কুম্ভ মেলা। বারো বছর অন্তর একবার করে পূর্ণ কুম্ভের মেলা বসে, পালা করে, হয় হরিদ্বারে নয় প্রয়াগে।

দুই পূর্ণ কুম্ভের মেলার মাঝখানে আবার অর্ধ কুম্ভের মেলা হয়। তার জাঁক জমক অনেক কম। পূর্ণ কুম্ভের মতো বড় মেলা নাকি সারা পৃথিবীতে আর কোথাও হয় না। ভারতের চারদিক থেকে, লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ যাত্রী এসে জমা হয়, মেলা দেখতে আর চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে, যথা সময়ে গঙ্গায় ডুব দিতে।

অগুন্তি মানুষের সমাগম হয়; তাদের কত রকম সাজ পোষাক, মুখে কত ভাষার বুলি। সব সমাজের সব স্তরের লোক আসে।

তবে এই লোক সমাগমের আসল উদ্দেশ্য মেলায় জিনিসপত্র বেচা-কেনা নয়। কুম্ভ মেলার পবিত্র গঙ্গাস্নানের কাছে এসব নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার। বাড়ি ফেরার সময় যাত্রীরা ঘট ভরে গঙ্গাজল আর মেলা থেকে নানান জিনিস কিনে নিয়ে যায়।

সমতলে গঙ্গা

হরিদ্বার ছেড়ে এসে গঙ্গা আরো প্রশস্ত হয়, স্রোতের বেগ আরো কমে যায়। অনেকগুলি খাল কেটে দূর দূর ক্ষেতে জল নিয়ে যাওয়া হয়। গাঁয়ের নৌকো চলাচল করে। সাহারাণপুর, মীরাট, আলিগড় ছেড়ে নদী ফারাক্কাবাদ পৌছয়। এখানে রামগঙ্গায় এসে মিলিত হয়। গঙ্গা এখানে অনেক চওড়া। কোথাও স্রোত বেশি, কোথাও চড়া, কোথাও বা গভীর।

এলাহাবাদের কাছে, প্রয়াগে, যমুনা নদীর জল গঙ্গায় এসে পড়ে। এইখানে তিনটি নদীর সঙ্গম—গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী। তবে সরস্বতী নদীকে চোখে দেখা যায় না, সে নাকি মাটির নীচে দিয়ে বয়ে চলে। যেখানে তিনটি নদী এক হয়েছে, সে জায়গাটাকে বলে ত্রিবেণী। ত্রিবেণী বড় পবিত্র স্থান। এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত, গঙ্গার বুকে যমুনার পরিষ্কার নীল জল আর গঙ্গার ঘোলা জলের স্রোতকে পাশাপাশি বয়ে যেতে দেখা যায়। তারপর দুই স্রোত মিলে যায়।

গঙ্গার সব উপনদীর মধ্যে যমুনাই হল প্রধান। যমুনার উৎপত্তি তেহ্‌রি-গাড়ওয়াল জেলায় যমুনোত্রীতে। অনেক তীর্থযাত্রী সেই জায়গাটি দেখতে যায়। তার কাছাকাছি কতকগুলি বড় সুন্দর গরম জলের ঝরণা আছে।

যমুনোত্রী ছেড়ে, যমুনা নদী পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকে। তারপর এক সময় পাহাড়ে মাটি ছেড়ে দূন উপত্যকায় এসে পৌছয়। এখান থেকে হিমালয়ের বরফে ঢাকা পাহাড়ের সারির অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। এই পথে 150 কিলোমিটার বয়ে গিয়ে, যমুনা নদী বিখ্যাত
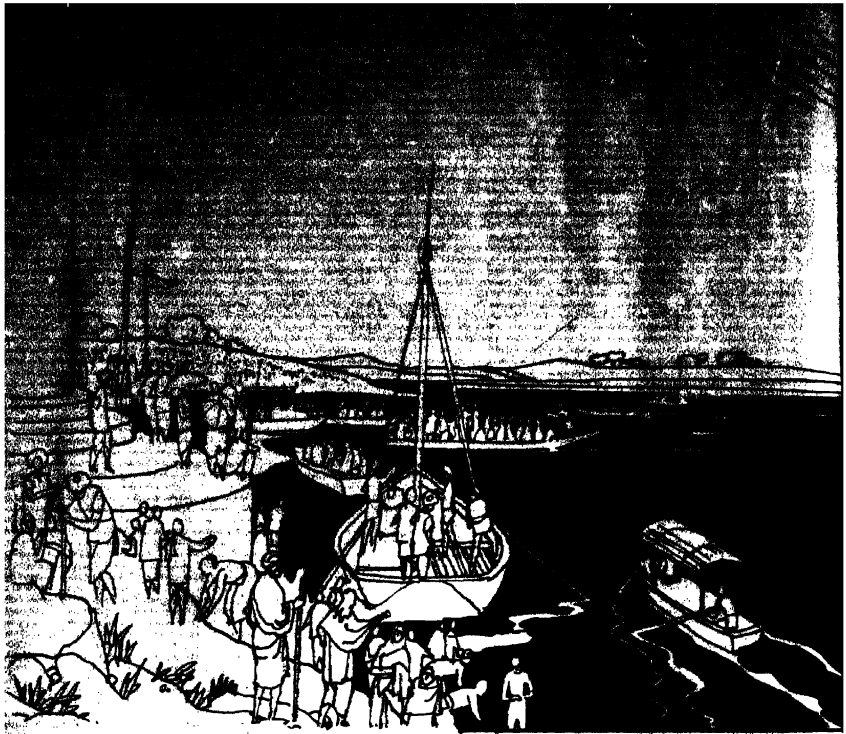
প্রয়াগের সঙ্গম

শিবালিক পাহাড় ভেদ করে, ফৈজাবাদের কাছে হিন্দুস্থানের বিশাল সমতল ক্ষেত্রে এসে পৌঁছয়।

যমুনার দুই তীর থেকে খাল কেটে লোকে তাদের শস্য-খেতের জলের ব্যবস্থা করেছে। যমুনার তীরে অনেকগুলো বড় শহর আছে। তার মধ্যে একটি হল ভারতের রাজধানী দিল্লী। আর আছে মথুরা, বৃন্দাবন। এই দুটি জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অনেক বছর কেটেছিল বলে শোনা যায়। আগ্রা শহরও যমুনার তীরে। দেশ-বিদেশ থেকে কত লোক তাজমহল দেখতে আগ্রায় আসে।

বড় সুন্দর নদী যমুনা, নীল ঢেউ তুলে, এঁকে-বেঁকে তার মনোহর স্রোত চলেছে। যেখানে যমুনা মাঠ থেকে উঠেছিল, সে জায়গাটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে 3,250 মিটার উঁচুতে

বেশ লম্বা নদী যমুনা তার উপর দিয়ে অনেকগুলি রেলের সেতু তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে দিল্লী, মথুরা, আগ্রা আর এলাহাবাদের ব্রিজ সবচেয়ে বিখ্যাত। তাছাড়া নৌকোর সাঁকো আছে। বড় সুন্দর লাগে এগুলি দেখতে আর শুকনোর সময় বড় কাজে লাগে।

নৌকার সাঁকো
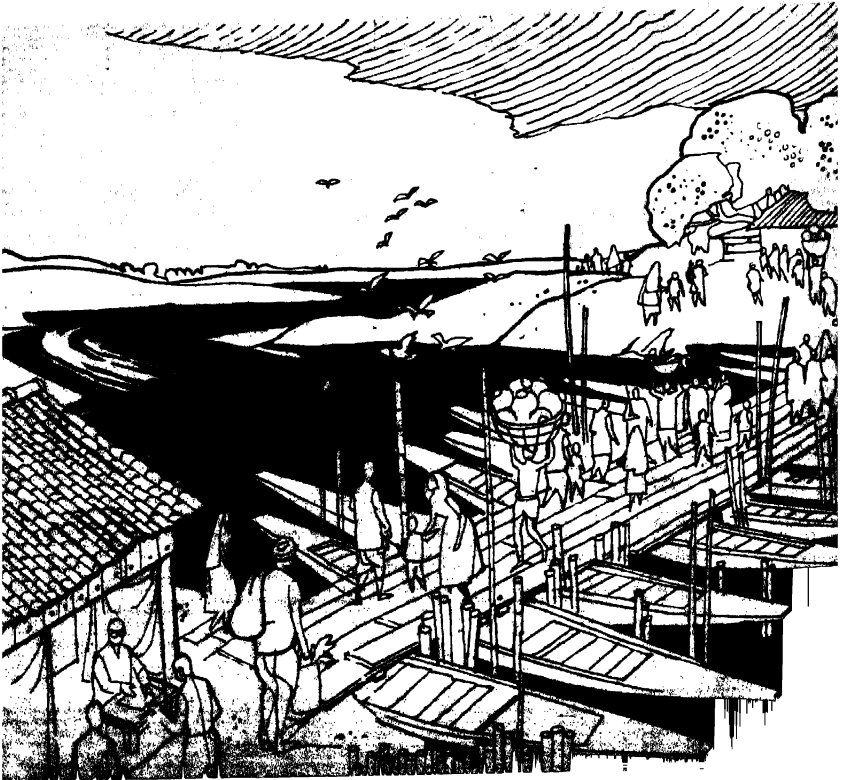
গঙ্গার তীরের সব চেয়ে বিখ্যাত শহর হল বারাণসী। এই শহরের আরেক নাম কাশী। আজকাল অনেকে কাশীকে বারাণসীও বলে। দুটি ছোট উপনদী, বরুণা আর অসী যেখানে এসে গঙ্গায় পড়েছে, সেইখানে এই শহর গড়ে উঠেছে। তাদের নামেই এর নাম বারাণসী। জায়গাটা এলাহাবাদ থেকে খুব দূরে নয়। হিন্দুরা কাশীকে সব চেয়ে পবিত্র তীর্থ স্থান বলে মনে করেন। এমন কি, অনেকের বিশ্বাস যে বারাণসীতে মরলে সোজা স্বর্গে যাওয়া যায়। এই সম্পর্কে একটা ভারি মজার গল্প শোনা যায়।

সেকালে লোকে বলত যে শিব-পার্বতীর দয়ায়, যদি কেউ কাশীতে মরে, তাহলে তার সব পাপ ক্ষমা হয়ে যায় আর সে সোজা স্বর্গে চলে যায়। সেই সময় ব্যাসদেব বলে একজন সাধু ছিলেন। তাঁর কিন্তু বড় বেশি অহঙ্কার ছিল। তিনি কাশীর পাশেই আরেকটি নগর তৈরি করে, তার নাম দিলেন ব্যাস-কাশী। তারপর তিনি শিবের তপস্যায় বসলেন। শিব খুসি হয়ে যখন তাঁকে বর দিতে চাইলেন, ব্যাস বললেন তিনি এই চান যে ব্যাস-কাশীতে যারা মরে, তারাও যেন সোজা স্বর্গে যেতে পারে। এখন শিব হলেন যেমনি দাতা, তেমনি অন্যমনস্ক। ব্যাসের কথা শুনে, তিনি তখনি বলে বসলেন, তথাস্তু।

এইভাবে কাশী তার বিশেষ গুণটি হারাল। কাশীর পুরোহিতরা দুর্গাকে ধরলেন, এর একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। পরদিন সকালে ব্যাসদেব তাঁর বাড়ির চত্বরে বসে আছেন, এমন সময় থুত্থুরে বুড়ি ঠুকঠুক করে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ও মশাই, এখানে মলে যেন কি একটা হয়?' ব্যাস বুক ফুলিয়ে বললেন, 'এখানে মলে সবাই স্বর্গে যায়, বুড়ি-মা।'

বুড়ি কানে শোনে না; তাই আবার বলল, 'অ্যাঁ? কি বললে, বাছা?'

ব্যাস একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'স্বর্গে যায়, স্বর্গে যায়।' বুড়ি কানে হাত দিয়ে বলল, 'কি? কোথায় যায়?' ব্যাসের কোনো কালেই বেশি ধৈর্য ছিল না। এবার চটে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'এখানে মলে সবাই স্বর্গে যায়।' বুড়ি আরো কাছে এগিয়ে এসে আবার জিজ্ঞাসা করল,

'কি বলছ কি? এখানে মলে লোকে কি করে?' এবার ব্যাসদেব রেগে চতুর্ভুজ হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'কি আবার হবে? এখানে মলে সবাই গাধা হয়, গাধা হয়।'

বুড়ি তাই শুনে বলল, 'তাই হোক।' এই বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাসদেব দেখে অবাক। অবাক হবার আসলে কিছু ছিল না; ঐ বুড়ি আসলে দুর্গা ঠাকরুণ নিজে; ব্যাস-কাশীর সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করতে এসেছিলেন। এর পর আর সহজে কেউ ব্যাস-কাশীতে মরতে চাইত না।

আজ পর্যন্ত কাশী হল সংস্কৃত শিক্ষার একটা বড কেন্দ্র। প্রতি বছর বহু বিদেশী ভ্রমণকারী এই প্রাচীন নগর আগ্রহের সঙ্গে দেখতে আসেন। এখানকার গঙ্গা তীর একবার দেখলে আর কখনো ভোলা যায় না। ধাপে ধাপে পুরনো পাথরের সিঁড়ি, মন্দির, মসজিদ, শ্মশান-ঘাট, কাতারে কাতারে মানুষ, নৌকোর ভিড় আর হাজার হাজার রঙ-বেরঙের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতা।

আরেকটি কারণে সমস্ত পৃথিবীতে বারাণসীর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। এখানকার রেশম আর কিংখাবের তুলনা হয় না। কাপড়ের খোলের জন্যে আর অপূর্ব কারুকার্যের জন্যে, হাতে বোনা জমকালো একখানি বারাণসী রেশমি শাড়ীর কাছে পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো কাপড় দাঁড়াতে পারে না।

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে যমুনা ছাড়াও গঙ্গার আরেকটি বিখ্যাত উপনদী আছে। তার নাম শোন নদী, শোনপুরের কাছে এর জল গঙ্গায় এসে পড়েছে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই শোনপুরের গরু-মহিষের মেলার খুব নাম-ডাক।

বাঁ দিক থেকে তিনটি নাম করা নদী গঙ্গায় পড়েছে। তার একটি হল গোমতী নদী। এর তীরে উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউ শহর। বহুদিন ধরে মুসলমানী সংস্কৃতির কেন্দ্র বলে লখনউ পরিচিত। আর আছে ঘরঘরা, তিব্বতের মানস সরোবর থেকে এই নদী উঠেছে। তারপর আছে গণ্ডক নদী।
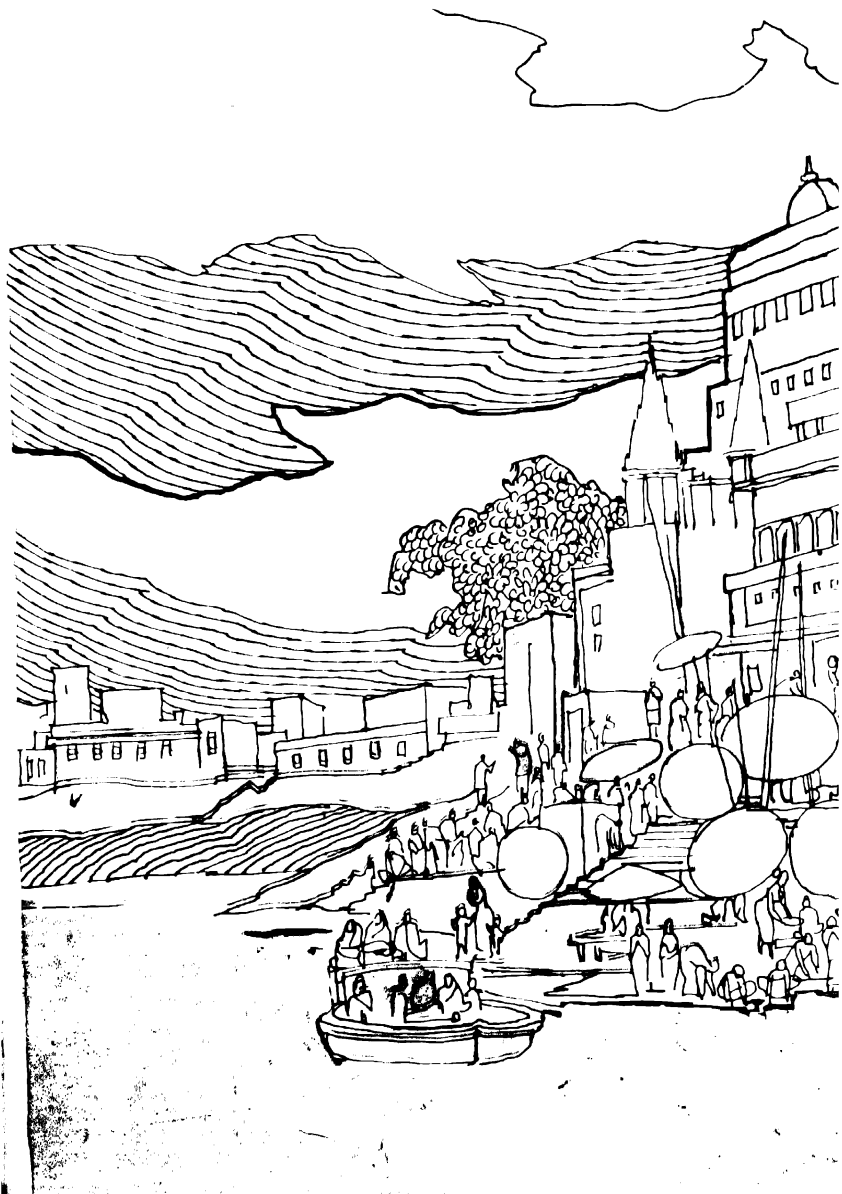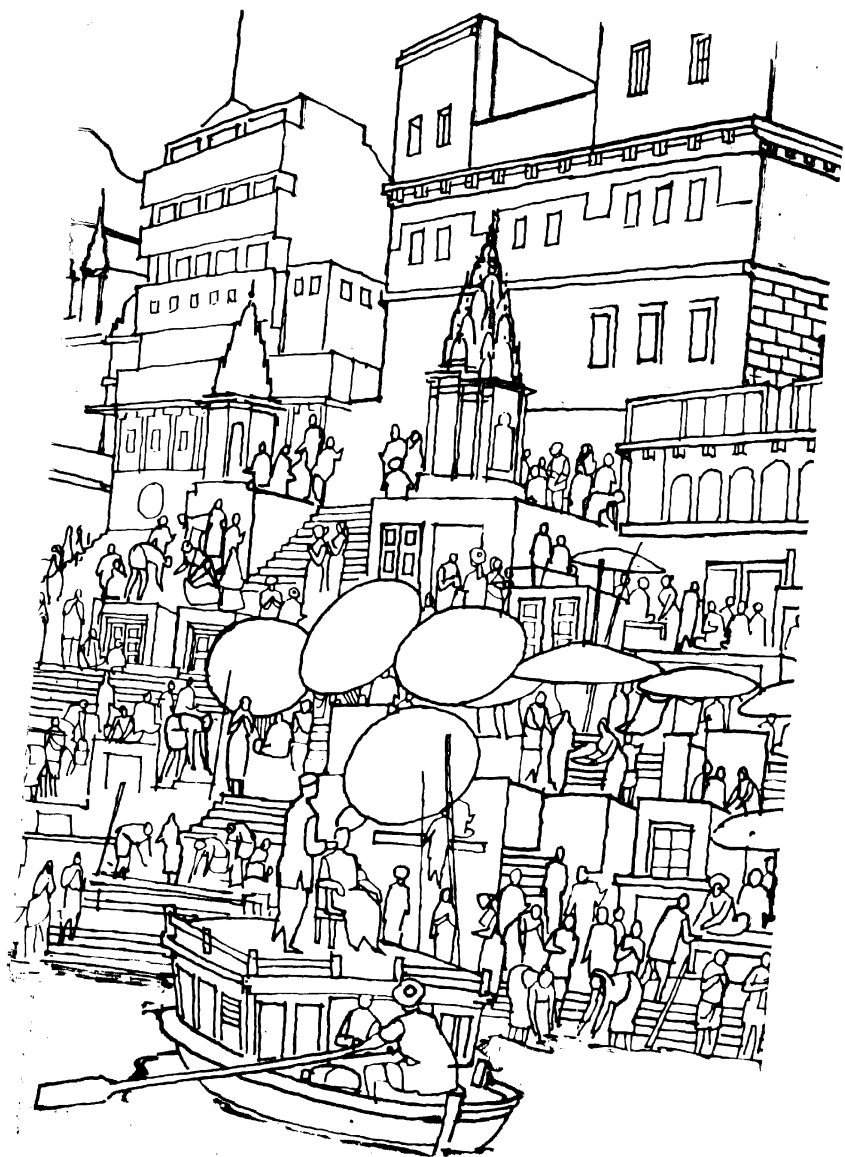
উত্তর প্রদেশের প্রধান জলপথ হল ঘরঘরা নদী। বহু প্রাচীনকাল থেকে এই নদীর নাম ছিল। অনেক ঐতিহাসিক পণ্ডিতের মতে ঘরঘরা নদীই হল সেকালের প্রসিদ্ধ সরযূ। এরই তীরে এককালে রাজা দশরথের রাজধানী অযোধ্যা নগরের অবস্থান ছিল। ছাপ্‌ড়ার কাছে ঘরঘরা গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে, তিনটি নদী এক সঙ্গে মিলে তবে গণ্ডক নদী হয়েছে। নেপালে এই নদীর নাম ত্রিশূলী গঙ্গা। পাটনার কাছে গণ্ডক গঙ্গায় পড়েছে। পাটনারও সেকালে খুব খ্যাতি ছিল। এখন যেখানে পাটনা, সেকালে সেখানেই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ রাজা অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্র ছিল। এখানে আজও অনেক ধ্বংসাবশেষ আর স্মৃতি-স্তম্ভ দেখা যায়। পাটনা ছেড়ে গঙ্গা আরো পূর্ব দিকে বয়ে চলে। তারপর কোশী নদীর জল এসে গঙ্গায় পড়ে। কোশী অনেক ছোট নদী।

তারপর গঙ্গা রাজমহলের ছোট ছোট পাহাড় আর টিলার পাশ দিয়ে, বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের কাছ দিয়ে বয়ে চলে। মুর্শিদাবাদ আর রাজশাহীর মাঝামাঝি, যতদূর পর্যন্ত না মাথাভাঙ্গা নদী গঙ্গা থেকে বেরিয়ে গেছে, লক্ষ্য করলে ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা রেখা দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ আর তার কাছেই বহরমপুর, দুটি জায়গাই রেশমী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। সেকালের মুসলমান নবাবরা এই সব অঞ্চলে অনেক প্রাসাদ ও দুর্গ তৈরী করেছিলেন।

গঙ্গার ব-দ্বীপটি প্রকাণ্ড বড়। এর শুরু হল বঙ্গোপসাগর থেকে তিনশো মাইল দূরে, যেখানে গঙ্গা নদী থেকে একে একে অনেক শাখা নদী বেরুতে আরম্ভ করেছে। গঙ্গার প্রধান স্রোতের নাম এখন পদ্মা। পদ্মা নদী পূব-দক্ষিণ দিকে বয়ে গিয়ে, বাংলাদেশে গোয়ালন্দে পৌঁছয়। গোয়ালন্দে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র একসঙ্গে মিশে গিয়ে, বিশাল এক নদী হয়। এই নদীর নাম মেঘনা। মেঘনা নোয়াখালির কাছে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে। এটাই হল গঙ্গার পূর্ব দিকের মুখ।

হুগলী হল গঙ্গার পশ্চিম মুখ। এই হুগলীর উপর কলকাতা শহর। এখান থেকে সমুদ্র 144 কিলোমিটার দূরে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে
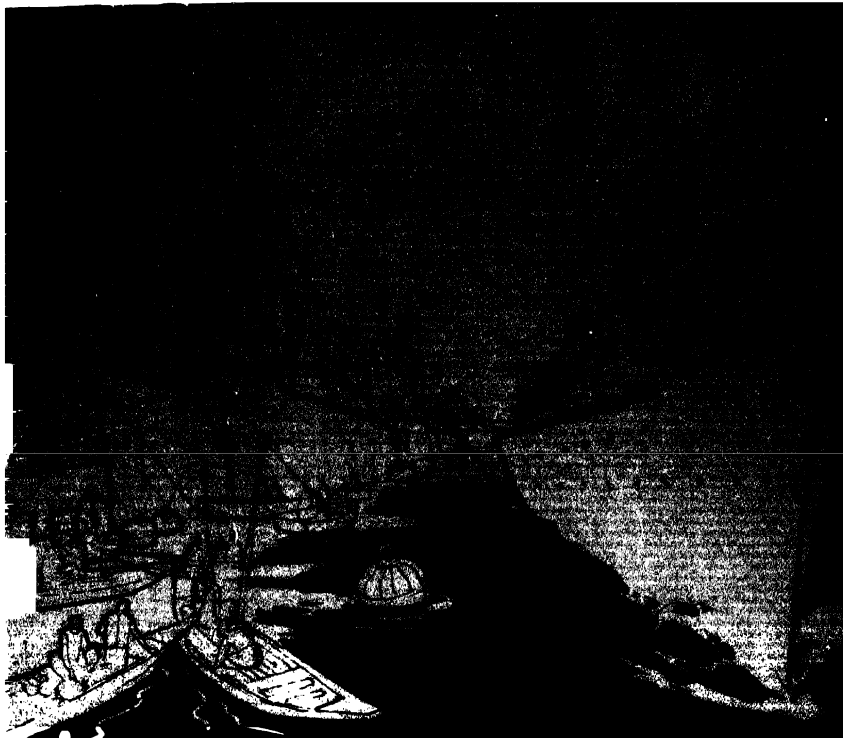
কলকাতা বন্দর

এসব জায়গার অনেক গুরুত্ব। কারণ আমাদের ভারতের এত লম্বা সমুদ্র তীর থাকা সত্ত্বেও, বড় বন্দর খুবই কম আছে।

কলকাতার বন্দর থেকেই ভারতের বাণিজ্যের অনেকখানি যাওয়া-আসা করে। দুঃখের বিষয় হুগলী আর তার শাখা নদীগুলো ক্রমে পলি পড়ে বুজে আসছে। তাতে জাহাজ যাওয়া-আসার ভারি অসুবিধা হচ্ছে। এই জন্যে ভারত সরকার বড়ই চিন্তিত। এইসব জলপথগুলিকে বাঁচাবার জন্য নানান পরিকল্পনা হচ্ছে।

কলকাতা থেকে কিছু দূরে সমুদ্রের আরেকটু কাছে হলদিয়া বলে নতুন একটা বন্দরের পত্তন হয়েছে। আশা করা যায় এতে কলকাতার

জাহাজ ঘাটের ভিড় কিছুটা কমবে। তা ছাড়া হুগলীর উপর দিয়ে আরেকটা সেতু তৈরির কথাও আছে।

গঙ্গার ব-দ্বীপের উত্তর দিকটা ভারি উর্বরা, কিন্তু দক্ষিণ দিকটা স্যাৎসেতে আর নোনা। সমুদ্রের কাছে আছে সুন্দরবনের বড় বড় গাছের ঘন জঙ্গল। এই সব জঙ্গলে অনেক বুনো জানোয়ার, বাঘ, অজগর, কুমীর ইত্যাদি বাস করে। মাছ ধরার পক্ষে এসব আদর্শ জায়গা। সমুদ্র থেকে জোয়ারের জল নদীর মুখ দিয়ে ঢুকে, অনেক মাইল উজান ঠেলে যায়। তার ফলে নদীর মোহনায় নানা রকম সুস্বাদু মাছ থাকে। এখানে প্রচুর ইলিশ, ভেটকি, চিংড়ি পাওয়া যায়।

গঙ্গার সমুদ্র যাত্রা

গঙ্গানদী 2,465 কিলোমিটার লম্বা। গঙ্গার উপত্যকাকে বলা হয় হিন্দু সভ্যতার লালন ভূমি, তার মানে যেখানে হিন্দু সভ্যতা আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে। হাজার হাজার বছর আগে মধ্য ইয়োরোপ ও এশিয়া থেকে আর্যরা দুর্গম গিরিপথ দিয়ে এদেশে এসেছিলেন। তাঁরা বিশাল গঙ্গা নদীর ধার দিয়ে ক্রমাগত পূব দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যেখানেই গিয়েছিলেন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের যা-কিছু বিদ্যা ও শিল্প-জ্ঞান ছিল। পুরনো অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁরা ক্রমে মিশে গিয়েছিলেন। পরে আর তাঁদের বংশধরদের আলাদা করে চেনা যেত না।

যাবার পথে তাঁরা উপনিবেশ আর ছোট ছোট নগর পত্তন করতে চলেছিলেন। কালে নদীর ধারের তাঁদের এইসব শহরের অনেকগুলিই সমৃদ্ধ ও বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। অনেক নগর বিদ্যাশিক্ষা আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়েছিল। এই বিশাল গঙ্গানদী যেন তাদের প্রাণস্বরূপ ছিল। নদীর তীরে যারা জীবন কাটাত, তারা ঐ নদীতেই স্নান করত, ওর-ই জল পান করত, ওর-ই বুকে নৌকো বাইত। খাল কেটে ওর-ই জল নিয়ে যেত দূরে দূরে কত শুকনো জমিতে। অবশেষে তারা যখন মারা যেত, এই গঙ্গার তীরেই তাদের চিতা জ্বলত। এই নদীকে তারা দেবতা মনে করে পূজা করত। তাদের বিশ্বাস ছিল এক ফোঁটা গঙ্গা জল পড়লেই তাদের দেহ মনের সব পাপ ধুয়ে যাবে।

গঙ্গাতীরের অনেক শহর হাজার হাজার বছরের পুরনো। হরিদ্বারে

নদীর ধারে, ওখানকার লোকরা কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে বলে ঐখানে নাকি দক্ষ রাজার প্রাসাদ ছিল।

যমুনার তীরে বারাণসীও অনেক দিনের প্রাচীন নগর। গৌতম বুদ্ধ তাঁর বাবার প্রাসাদ ত্যাগ করে, প্রথমেই বারাণসীতে গিয়েছিলেন, সেখানকার পণ্ডিতদের কাছে বিদ্যা সাধনা করবার উদ্দেশ্যে। সে-ও আড়াই হাজার বছরেরও আগের ঘটনা। তখনো জ্ঞান-বিদ্যার কেন্দ্র বলে বারাণসীর খ্যাতি ছিল।

সেকালে যে গঙ্গার ধারের শহরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল, সে বিষয়ে অনেক পুরনো কিংবদন্তী আছে। গঙ্গার বুকেও সুন্দর সুন্দর বড় নৌকোকে অনেকগুলি পাল তুলে ভেসে বেড়াতে দেখা যেত। দলে দলে বাণিজ্যের নৌকো গঙ্গার স্রোত ধরে সমুদ্রে পড়ে, বঙ্গোপসাগর পার হয়ে সুদূর বিদেশ পর্যন্ত পাড়ি দিত। আজ পর্যন্ত সুদূর প্রাচ্যের অনেক দ্বীপে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

নানান পুরনো গল্প থেকে বোঝা যায় যে, এক সময় নৌকো বেয়ে গঙ্গানদীর বুকে ভেসে, নদীর মোহনা থেকে হিমালয় পর্বত পর্যন্ত, সমুদ্র থেকে নদীর উৎপত্তি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ছিল।

গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকো করে প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। আজ পর্যন্ত নদীর উপরে বড় বড় নৌকো বোঝাই নানা রকম শস্য, তুলো, খড়, কয়লা, কাঠ, গুড় আর অন্যান্য চাষের জিনিস যাওয়া-আসা করছে দেখতে পাওয়া যায়। নিরাপত্তার জন্য এসব নৌকোর তলাটা চ্যাপ্টা হয়, যাতে সহজে বাধা না পায়। কোনো কোনো নৌকো পাল আর দাঁড়ের সাহায্যে চলে, কোনো কোনো নৌকোয় আধুনিক মোটর লাগানো থাকে। এক সারি নৌকো, একটার পর একটা নিঃশব্দে নদী বেয়ে চলেছে, বাতাস লেগে তাদের পাল-গুলি ফুলে উঠেছে, এর চাইতে সুন্দর শান্তিময় দৃশ্য আর কি হতে পারে?

সমুদ্রগামী জাহাজ কলকাতা ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কলকাতা থেকে সমুদ্র মাত্র 144 কিলোমিটার দূরে।

কলকাতা থেকে 50 কিলোমিটার দূরে ডায়মণ্ড হারবার বড় সুন্দর জায়গা। এইখানে রূপনারায়ণ নদী গঙ্গায় এসে পড়ে। এখানকার দৃশ্য

অপূর্ব। নদী এত চওড়া যে অনেক জায়গায় ওপার দেখা যায় না। সমুদ্রের কাছে সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল। সেখানে অনেক বন্য জন্তুর বাস। শোনা যায় এখানেই নাকি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আদি জন্মভূমি। তাদের সংখ্যা আজকাল এতই কমে যাচ্ছে যে পশু-সংরক্ষণ বিভাগ নানা পরিকল্পনা তৈরি করছেন।

গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গা সাগর পর্যন্ত গঙ্গার সমস্ত গতিপথেই নানা দেখবার জিনিস আছে। গঙ্গার অপূর্ব সৌন্দর্য, গঙ্গার আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য, গঙ্গার পবিত্রতা, এসবের তুলনা নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এই নদী তার দুই তীরের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে একটা বন্ধন-সূত্রের মতো। বহু প্রাচীন কাল থেকেই গঙ্গা-তীরের নানা রাজ্যের মধ্যে এই নদী ছিল একটা যোগসূত্র। এই সব অধিবাসীরা ভিন্ন ভাষায় কথা বলত, ভিন্ন রকম পোশাক পরত, তাদের আচার-নিয়ম খাওয়া-দাওয়া সবই আলাদা রকমের ছিল। তার ফলে তারা পরস্পরের কাছে একেবারে অপরিচিত অনাত্মীয়ের মতো হতে পারত, কিন্তু মাঝখানে এই বিশাল নদীর যোগ-সূত্র থাকায়, তা হয় নি।

তাদের মনে হত তারা সবাই মা-গঙ্গার সন্তান। এই মা গঙ্গার আশীর্বাদে ভারতের উত্তর-পশ্চিমের উঁচু পর্বত শিখরে গঙ্গার উৎপত্তি থেকে, গঙ্গা সাগর অবধি সমস্ত দেশ সুজলা সুফলা হয়ে উঠেছে।

সেই আদিকাল থেকে গঙ্গা-নদী বয়ে চলেছে। নদীর মুখগুলি কেবলই সমুদ্রে জল ঢালছে। যেখানে তাদের যাত্রাপথ শেষ হয়েছে, সেখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পলিমাটির রঙ লেগে সমুদ্রও যেন লালচে রঙ ধরেছে। এইখানেই গঙ্গা শেষ হয়েছে। উৎপত্তি থেকে সাগর পর্যন্ত এই নদী সকলের ভক্তি ভালোবাসা যেন দুই হাতে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

ব্রহ্মপুত্র

বরফে ঢাকা অপূর্ব সুন্দর হিমালয় পাহাড় বেয়ে সাদা ফেনায় ভরা ব্রহ্মপুত্র নদীর নীল জল দেখবার মতো জিনিস। ধ্যান-গম্ভীর হিমালয়ের গভীর সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে দিয়ে উদ্দাম জলের রাশি ছুটে চলেছে, একবার দেখলে ভোলা যায় না। হলদে কালো ধনেশ পাখির ঝাঁক তার উপর দিয়ে ভুটানের পাহাড় তলিতে চরতে যায়। এ যেন সত্যিকার দৃশ্য নয়; মনে হয় বুঝি স্বপ্নে দেখা। মনে এমন আনন্দ আর বিস্ময় জাগে যে মুখে কথা সরে না।

কত দেশ দেখে তবে ব্রহ্মপুত্র ভারতে নেমে আসে। তিব্বতে কৈলাশ পাহাড়ের পাদ-দেশে নদীর জন্ম। জায়গাটা সমুদ্র থেকে প্রায় 5,100 মিটার উঁচুতে। প্রকাণ্ড এক হিমবাহ থেকে একটি নদী বেরিয়ে এসেছে। নদীর নাম সাং-পো; তার মানে যে পবিত্র করে। বিখ্যাত মানস সরোবর এখান থেকে খুব দূরে নয়। কাছেই সিন্ধু আর শতদ্রুর জন্মস্থান।

1,120 কিলোমিটার ধরে সাং-পো হিমালয়ের পাশে পাশে বয়ে চলে। হিমালয় থেকে নদীর তফাৎ মাত্র 160 কিলোমিটার। দুই তীর থেকে উপনদীর জল পড়ে; সাং-পো ক্রমে আরো চওড়া, আরো গভীর হয়ে ওঠে। নদীর পথ হল তিব্বতের উঁচু মালভূমির উপর দিয়ে। সেখানে বছরের বেশির ভাগ সময়ই বেজায় ঠাণ্ডা। তার উপর কোথা থেকে একটা হাড় কাঁপানো বাতাস বইতে থাকে। অনেক জায়গাতেই লোকের বাস নেই। আবার কোথাও কোথাও নদীর ধারে ছোট ছোট নগর, গ্রাম। কোথাও বা রাখালরা তাঁবু খাটিয়ে, ছাউনি বানিয়ে, তাদের ইয়াক, গরু, ভেড়ার পাল রাখে।

পথে লাসা শহর পড়ে। এইখানে পাহাড়ের উপরে 'পোতালা' নামক বিখ্যাত প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায়। দালাই লামা আগে এই প্রাসাদে থাকতেন।

নদী এখানে বেশ চওড়া। চারশো মাইল ধরে নানা রকম নৌকোর যাতায়াত আছে। এসব নৌকোর বেশির ভাগই হল ইংরাজীতে যাকে বলে করেকল্; অর্থাৎ উইলো গাছের ডালের একটা কাঠামোর উপরে জানোয়ারের চামড়া জড়ানো। তাই হাল্কা আর মজবুত হয় এই ধরণের নৌকো। এই উঁচু মালভূমি থেকে যারা ভারতের সমতল ক্ষেত্রে নেমে আসে, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই এই ধরণের নৌকো চড়ে নদী পার হয়। কোথাও কোথাও অবিশ্যি বাঁশের ঝোলানো পুল আছে, তার উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করা যায়।

ব্রহ্মপুত্র
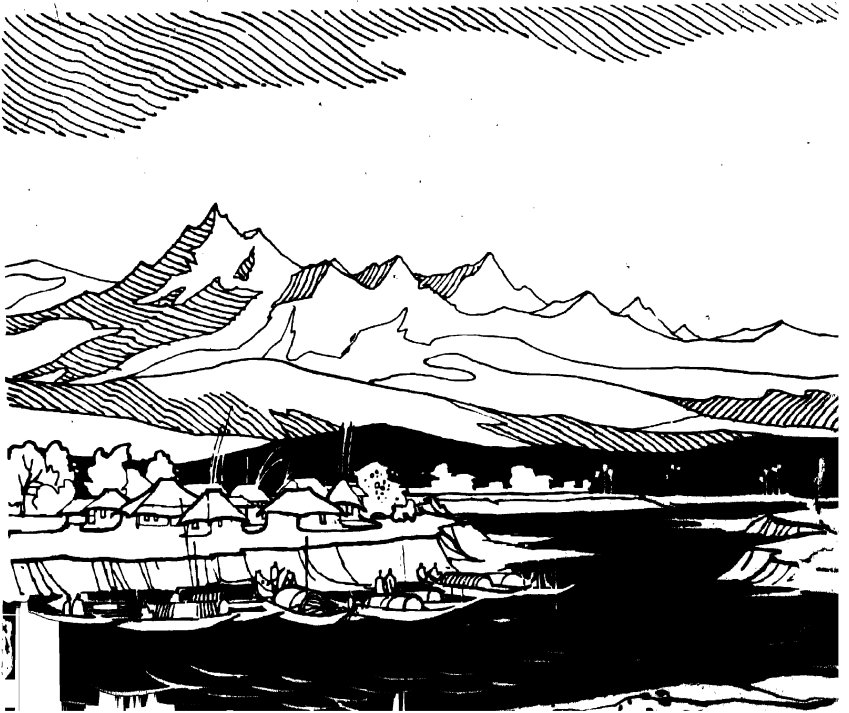
পাহাড়ের কাছে তিস্তা নদী

ত্‌শেলাজং বলে এক জায়গায় নদী প্রায় 3.2 কিলোমিটার চওড়া। তারপরেই কিন্তু গগনচুম্বী বিশাল পাহাড় ভেদ করে সাং-পো এগিয়ে চলে, প্রথমে পশ্চিম দিকে, তারপর বেঁকে দক্ষিণ মুখো হয়ে। পৃথিবীতে সবচেয়ে উঁচু পর্বত শিখর হল মাউন্ট এভারেস্ট। নদীর ধারের এইসব পাহাড় তার চেয়ে সামান্য কম। যতই নিচে নামে, নদীর স্রোতের বেগ ততই বাড়ে। সরু সরু গিরিখাতের ভিতর দিয়ে ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে নদী ছুটে চলে। সমস্ত পৃথিবী যেন কাঁপে ; এমনি প্রচণ্ড বেগে উদ্দাম স্রোত লাফ দিয়ে নিচে নামতে থাকে। তারপর নামার পালা শেষ হয় ; নদী পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে, খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসে। সোদিয়ার সীমান্ত রেখা পার হয়ে সাং-পো ভারতে প্রবেশ করে,

আসামের উপত্যকা ধরে বয়ে চলে। অনেক উপনদী এসে জল ঢালে, পূব থেকে দীবাং, শেশিরি আর পশ্চিম থেকে সুন্দরী, ভয়ঙ্করী তিস্তা। সাং-পোর এখন কি বিশাল রূপ, কি গর্জন। নাম তার ব্রহ্মপুত্র।

720 কিলোমিটার ধরে আসামের উপত্যকার মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মপুত্র বয়ে যায়। এ নদীর একটা বিশেষত্ব আছে। প্রায়ই তার গতি বদলায়। নদীর খাত প্রায় 9.6 কিলোমিটার চওড়া। কখনো এক ধার দিয়ে স্রোত চলে, কখনো বা অন্য ধার দিয়ে। সমুদ্র যাবার পথে নানা জায়গায় ব্রহ্মপুত্রের নানা নাম। ভারতে পৌঁছবার পরে প্রথম দিকে ওর নাম যমুনা। গোয়ালন্দে গঙ্গার সঙ্গে মিলবার পর নাম হয়ে যায় পদ্মা। আবার সমুদ্রের কাছে পৌঁছলে সবাই ওকে মেঘনা বলে জানে। এই নামেই ব্রহ্মপুত্র বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দেয়। যাত্রা পথের বেশির ভাগটাই পূর্ব ভিতরে পড়ে।

মানস সরোবরের কাছে যেখানে ব্রহ্মপুত্রের জন্মস্থান, সেখান থেকে যদি মাপা যায়, তাহলে লম্বায় ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার চাইতে 400 কিলোমিটার বেশি হয়। তবে এই দৈর্ঘ্যের বেশির ভাগই ভারতের বাইরে পড়েছে, প্রথম দিকে তিব্বতে আর শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে।

মাপে 938.600 বর্গ কিলোমিটার বিশাল এক ভূ-খণ্ড জুড়ে ব্রহ্মপুত্রের আবহ। নদীর উদ্দাম স্রোত এক জায়গায় পাড়ি ভাঙ্গে, আবার অন্য জায়গায় গড়ে। দুই তীরের মাটি বড় উর্বরা, কারণ ব্রহ্মপুত্রের জল বড় মিষ্টি, তাতে নুন নেই।

এ নদী খুব সামান্য নয়। বঙ্গোপসাগর থেকে আসাম 1,280 কিলোমিটার দূরে। এই সমস্ত পথটাই নৌকো চলাচলের যোগ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই হোক, বা ভ্রমণের জন্যই হোক, এমন চমৎকার জলপথ কম আছে।

ব্রহ্মপুত্রে উজান যাত্রা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে, কেউ কেউ মাঝে মাঝে স্টীমারে ছুটি কাটাতেন। কলকাতার হুগলী নদীর একটা জাহাজ ঘাট থেকে রওনা হয়ে তাঁরা ব্রহ্মপুত্র নদীর স্রোত ঠেলে উত্তর আসামের মাথায় একেবারে ডিব্রুগড় অবধি যেতেন। স্টীমার চেপে ঐভাবে বেড়ানো যাদের কপালে ঘটেছিল, তারা আর সে-কথা কখনো ভোলে নি।

কলকাতার একটা কম ভিড়ের ঘাটে জাহাজ বাঁধা থাকত। গুটি-কতক মাত্র যাত্রী ; তারা গড়ি-মসি করে একে একে জাহাজে উঠত। স্টীমারের গেরস্থালীর ভার যার উপর, তাকে সবাই বলত বাট্‌লার। সে-ই সকলের দেখাশুনো করত। প্রায়ই তার মতো নিপুণ রাঁধিয়ে খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। কেবিন যাত্রীদের সে যে কি ভালো খাওয়াত সে আর বলবার নয়। ঘাটে ঘাটে যেই জাহাজ ভিড়ত, বাট্‌লার অমনি স্থানীয় মাছ, ডিম, মুরগি, দুধ, ফল, তরকারি, তাজা তাজা কিনে নিত।

ব্যাপারটি বড়ই উপভোগ্য ছিল। কেবিন যাত্রীরা উপর তলার খুদে পাটাতনে বেতের গোল চেয়ারে বসে, চেয়ে চেয়ে দেখত নদীর তীর কেমন পিছনে পড়ে থাকছে। ঐখানে বসে তারা দেখত জাহাজ যেমন এগিয়ে চলেছে চার পাশের দৃশ্যও কেমন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। গাছপালা, ফল-শস্য, এমন কি নদীর ধারের বাড়িঘরের আকার, সেখানকার লোকদের মুখের চেহারা, যে সব জিনিস তারা বেচতে আনত, সবই অন্য রকম হয়ে যেত। কলকাতা থেকে বঙ্গোপসাগর 144 কিলোমিটার দূরে, কিন্তু খুদে জাহাজটি অতদূর যেত না। নামকানা নামের সরু খালের

মুখে পৌঁছতে তার অর্ধেক দিন লাগত। কেবিন যাত্রীরা ছাড়াও, জাহাজের এক তলায় অনেক ডেক–প্যাসেঞ্জার থাকত। প্রত্যেক ঘাটে স্টীমার থামলেই, তাদের মধ্যে কয়েকজন নেমে যেত; তাদের জায়গায় আবার কয়েকজন নতুন লোক উঠত। তার পরে খানিকটা চ্যাঁচামেচি, খানিক তক্তা ঠোকাঠুকি শিকলের ঝন-ঝনানি। তার পরেই খুদে স্টীমার আবার চলত।

স্টীমারের দুই পাশে মাল বোঝাই দুটি ভেলা, তাকে ফ্ল্যাট বলে। ফ্ল্যাট নিয়ে জাহাজকে অনেকটা জায়গা জুড়ে এগুতে হত। এদিকে খালগুলো বেশ সরু। \কাজেই খুব সাবধানে যেতে হত, দুই পাশে খুব সামান্যই জায়গা থাকত। এমনিতেই তাড়াতাড়ি যাবার উপায় ছিল না। জোয়ারের সময় ছাড়া যাওয়াই যেত না; কম জলে স্টীমারের তলা মাটিতে বসে যাবার ভয় ছিল। এখানকার জোয়ার মানে সত্যিকার সমুদ্রের জোয়ার। সব নদীর মুখ দিয়েই স্রোত ঠেলে জোয়ারের জল ঢুকে পড়ে। কলকাতা পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই হুগলী নদীতেও জোয়ার-ভাঁটা দেখা যায়।

এদিকে ডেকে বসেই যাত্রীরা নদীর ধারের ক্ষেত খামার বাড়ি ঘর দেখতে দেখতে যেত। নামকানার মুখ থেকে মাত্র চার ঘণ্টার পথ হল সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল।

স্টীমারের পথ অসংখ্য খাল আর ছোট বড় শাখা নদীর মধ্যে দিয়ে। দিকভ্রম হবার এতই ভয় যে যেসব মাঝিরা এখানে স্টীমার চালায়, তাদের এই কাজের জন্যই বিশেষভাবে শিক্ষা নিতে হত। কিন্তু বড়ই আনন্দের বেড়ানো। মাঝে মাঝে যাত্রীদের চোখে পড়ত কালা-মুখো হনুমান, হরিণ, কুমীররা নদীর পাড়িতে রোদ পোয়াচ্ছে। এমন কি কখনো কখনো ভয়ঙ্কর সুন্দর রয়েল বেঙ্গল টাইগারকেও জল খেতে দেখা যেত।

এমনি করে সরু সরু জলপথ ধরে এক সময় স্টীমার চওড়া পদ্মা নদীতে গিয়ে পড়ত। এই প্রকাণ্ড নদী গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলের রাশি.ক সমুদ্রে পৌঁছে দেয়। এখন এর বেশীর ভাগ জায়গাই

বাংলাদেশের এলাকায়। দ্বিতীয় দিন গভীর রাতে স্টীমার খুলনা পৌঁছত। মাঝে মাঝে নদীতে ঘন কুয়াশা থাকত; স্টীমার এগুতে পারত না। এগুবার চেষ্টা করার অনেক বিপদ, কে জানে কোথা থেকে কোন দিক দিয়ে গ্রামের লোকে দাঁড় বেয়ে নৌকো নিয়ে আসছে, ধাক্কা লাগলে বেজায় মুস্কিল।

যেখানে নদী কিছু চওড়া, সেখানেই জাহাজ আর নৌকোর ভিড়। তারই মধ্যে দিয়ে স্টীমার নদীর প্রবল স্রোত ঠেলে উজানে এগিয়ে চলত। দুই পাশে ছোট বড় মাছ ধরার নৌকো, শস্য আর খড় বোঝাই মালের নৌকো দেখা যেত। কত স্নানের ঘাট পেরিয়ে যেতে হত, তাদের সিঁড়িগুলো ইট আর সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। গ্রামের লোকরা সেখানে স্নান করতে আসত। এইখানে নদীর নাম মধুমতী।

দুই দিন পরে স্টীমার বরিশাল পৌঁছত। এখানকার বন্দরটির খুব নাম ডাক। স্থানীয় লোকরা যাত্রীদের বলত, ঐ শুনুন বরিশালের 'গান', অর্থাৎ বন্দুকের শব্দ। আসলে বন্দুক নয়, তবু শব্দটা বেশ অদ্ভুত। আশে পাশের সব জায়গা থেকেই এই গুম গুম শব্দ শোনা যেত। তার কারণ কেউ সঠিক বলতে পারে না। অনেকের মতে জলের স্রোত আর সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার জন্যই এমন হয়।

নদীর চেহারা এবার আস্তে আস্তে বদলাতে শুরু করে। বালির তীরের জায়গায় এখন দেখা যায় কাদা-মাটির উঁচু পাড়। তীরের রেখাও ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, মাঝে মাঝে উঁচু নিচু। একটু পরপরই স্টীমার থামে, মাল ওঠে, মাল নামে। ছোট ছোট নৌকো এসে হাজির হয়, তাতে করে গ্রামের লোকরা তাজা শাক-সবজি, মাছ, মিষ্টি খেজুর রস বেচতে নিয়ে আসে। এরপর স্টীমার গোয়ালন্দ পার হত। এইখানে গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম। এখান থেকেই নদীর নাম পদ্মা। জাহাজ স্রোত ঠেলে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলত। এখন আর বালির চড়া দেখা যায় না; গঙ্গায় যেমন যায়। এই হল আসল ব্রহ্মপুত্র, সুদূর তিব্বতের উঁচু মালভূমি থেকে এই চঞ্চলা নদী নেমে এসেছে। দুই তীরে ছোট ছোট সবুজ কলা বাগান। গাছে গাছে থোলো থোলো হলদে কলার বড় বড় কাঁদি ঝুলত। নদীর

ধারে সাদা বালি আর নদীর বুকে ভাসা নৌকোর সাদা আর রঙ-চঙে পাল রোদ লেগে চিক চিক করত।

যাত্রীরা তাদের বেতের চেয়ারে বসে কোথাও কোনো রেলের লাইন বা স্টেশনের চিহ্ন দেখতে পেত না। মনে হত সব মালই নৌকো করে চালান দেওয়া হয়। জাহাজেই বা কত বিচিত্র মাল তোলা হত তার ঠিক ছিল না। কাপড়ের গাঁটরি, টিন টিন কেরোসিন তেল, গ্যালন গ্যালন রঙ, লোহার গরাদ, বালতি, বাসনপত্র। এসব জিনিস লোকালয় থেকে দূরে, নির্জন সব গ্রামে বিক্রির জন্য আমদানি হত।

চিলমারি বলে একটা জায়গা পেরিয়ে যেতে হত। এককালে এই জায়গাটা কাঁসা পিতলের বাসনের জন্য বিখ্যাত ছিল। তখন দেখা যেত শুধু পাটের গাদা ঘাটের পাশে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে।

চিলমারি ছাড়িয়ে নদীটাকে অনেক সরু মনে হয়। এখানে ওখানে সরু লম্বা বালির চরা। সাধারণতঃ নদীর স্রোত অনেক বালি আর পলি-মাটি ভাসিয়ে আনে। তারপর যেখানে স্রোতের বেগ একটু কম থাকে, সেখানে ঐ বালি আর মাটি জলের নিচে পড়ে থাকে। এই ভাবে বালির চরা তৈরি হয়।

যাত্রাপুর বলে একটা ঘাটে জাহাজ থামত। এইখান থেকে আসামের এলাকা আরম্ভ হয়েছে। আরো এগিয়ে গেলে ধুবড়ি পৌছনো যায়। এককালে ধুবড়ির খুব নাম ডাক ছিল। সুন্দর শহর, একেবারে নদীর তীর ঘেঁষে বাড়িঘর। দেখে মনে হয় এই বুঝি নদীর জলে হুড়মুড় করে সব ভেঙ্গে পড়ল। পদ্মার ইলিশের মতো, ধুবড়ির মাছও আস্বাদের জন্য বিখ্যাত। জাহাজের বাটলাররা এখান থেকে প্রায়ই মাছ কিনত।

আস্তে আস্তে দুই ধার থেকে পাহাড়গুলো নদীর কাছে এগিয়ে আসে। তাদের রঙ গাঢ় সবুজ ; আগা গোড়া গাছপালা লতা-গুল্মে ঢাকা। শীত-কালে নদী শান্তভাবে বয়ে যায়। ঢেউ প্রায় থাকেই না। শুধু থেকে থেকে গোছা গোছা কচুরি পানা ভেসে যায়। পাহাড় আরো কাছে আসে। একটা বিশাল তিন-চূড়ো পাহাড় সবার উপরে মাথা উঁচিয়ে থাকে।

গোয়ালপাড়া ছাড়ালেই পাহাড়গুলো আবার দূরে সরে যায়। পলাশবাড়িতে স্টীমার থামত। নদীর ঘাটে স্থানীয় লোকরা ডিম, জ্যান্ত পায়রা, পাকা কমলা বেচতে আসত। লোকগুলোর চেহারাও অন্য রকম, হাসি-খুসি মুখ, বাঁকা চোখ। অবশেষে জাহাজ পাণ্ডুঘাটে এসে লাগত। এখানে শিলং-যাত্রীরা নেমে যেত। পাহাড়ে শহর শিলং হল আসামের রাজধানী ; বড় সুন্দর জায়গা। পাণ্ডুঘাটও ভারি সুন্দর। দূরে দূরে নীল পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যায় ; নদীর বুকে এখানে ওখানে কালো বিন্দু, দেখে মনে হয় ছোট ছোট দ্বীপ। স্রোতের সঙ্গে শুশুকের দল খেলা করে। তাদের গা থেকে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ে। তাতে রোদ পড়ে মনে হয় যেন সোনা ঝরছে।

রাতে এখান থেকে গৌহাটির আলো দেখা যায়। উঁচু পাহাড়গুলির চূড়ো কুয়াশায় ঢাকা। উমানন্দ ভৈরবের পাশ দিয়ে স্টীমার যেত। উমানন্দের গ্র্যানাইট পাথরের ভিৎ একেবারে জলের বুক থেকে উঠেছে। ডেক থেকে ভৈরবের মন্দিরের চূড়ো স্পষ্ট দেখা যায়।

এখানে ঘূর্ণিজলের ভয়। কত জাহাজ যে ডুবেছে তার ঠিক নেই। নদী খুব গভীর, তার উপর প্রচণ্ড প্রবল স্রোতের টান।

অবশেষে স্টীমার গৌহাটি পৌঁছত। গৌহাটি বেশ বড় শহর, কর্ম-কোলাহলে ভরা। সেকালে এ জায়গার নাম ছিল। কাছেই একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আর একটি অতি প্রাচীন তীর্থস্থান, পাহাড়ের উপরে কামাখ্যার মন্দির। বহু প্রাচীন কাল থেকেই স্থানীয় লোকরা এই দেবীকে যেমনি ভয়, তেমনি ভক্তি করত। ঐ পাহাড়ে সহজে কেউ রাত কাটাতে রাজি হত না। নাকি নিরাপদ নয়। তবে আজকাল সে-সব পুরনো কুসংস্কার অনেক কমে গেছে। লোকে কামাখ্যার পাহাড়কে যত না ভয় করে, তার অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করে তার চেয়ে বেশি।

যদি জাহাজের কোনো যাত্রী লোহিত নদী পেরিয়ে আরো উত্তরে যেতে চাইত, তাকে গাড়ি করে যেতে হত। নদীর স্রোত এত প্রচণ্ড আর নদীর বুকে এত পাথর যে জাহাজের পক্ষে ডিব্রুগড় ছাড়িয়ে আর এগুনো

বিপজ্জনক ছিল। বিশাল হিমালয় পাহাড়ের কাছ দিয়ে এই যে চঞ্চলা নদী নেচে গেয়ে, ফেনা উড়িয়ে, কলকল ঝরঝর শব্দ করে ছুটে আসছে, এ যে সেই একই ব্রহ্মপুত্র যার বুকের উপর দিয়ে এত দিন ধরে যাত্রীরা স্টীমারের ডেকে বসে ভ্রমণ করেছে, একথা বিশ্বাস করা শক্ত।

পঞ্চনদের তীর্থযাত্রী

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের প্রসিদ্ধ রাজ্যগুলির মধ্যে পাঞ্জাব ছিল একটি। 'পঞ্চ অব' অর্থাৎ পাঁচ নদী থেকে পাঞ্জাবের নাম হয়েছে। এই পাঁচটি নদী হল ঝিলম বা বিতস্তা, চেনাব বা চন্দ্রভাগা, রাবি বা ইরাবতী, বিয়েস বা বিপাশা আর সাটলেজ বা শতদ্রু। কথিত আছে এই শতদ্রু নদীতে রামচন্দ্র প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে শুধু শতদ্রু নদীর উৎপত্তি হিমালয়ের অন্তঃস্থলে, তিব্বতের উঁচু মালভূমিতে, মানস সরোবরের কাছে। এই নদীর গতিপথের অনেকখানিই ভারতীয় ভূমির উপর দিয়ে। অনেক উপনদীর জল সংগ্রহ করে তারপর শতদ্রু পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবেশ করে। শতদ্রু নদীর প্রশংসা কত পুরনো উপকথা আর গানের মধ্যে পাওয়া যায়।

পাঁচ নদীর মধ্যে সব চাইতে পশ্চিমে হল ঝিলম। ঝিলমের জন্ম উলার হ্রদে। চেনাবের উৎপত্তি লাহল-স্পিতিতে। চেনাব জম্মু আর কাশ্মীরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। পাকিস্তানে পৌঁছে এই পাঁচ নদী এক সঙ্গে মিলে, পঞ্চ-নদ নামে পরিচিত।

এদিকে সিন্ধু নদীর উৎপত্তি হল কৈলাশ পাহাড়ের কাছে। এই কৈলাশেই নাকি হিন্দু দেবতারা বাস করেন। সিন্ধু নদী হিমালয়ের খাঁজে খাঁজে বয়ে চলে দক্ষিণ দিকে। পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছলে সিন্ধু-নদীতে পঞ্চ-নদের মিলিত জল এসে পড়ে। এখানে নদীর উপত্যকা বড়ই শুকনো, অনুর্বরা। তার মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে, সিন্ধু আরব সাগরে গিয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষ তীর্থস্থান আর তীর্থযাত্রীদের দেশ। পাহাড়েই হোক বা সমতল জায়গাতেই হোক, এই সব পবিত্র জায়গাগুলির বেশির ভাগের অবস্থান হয় সমুদ্রের তীরে, নয়তো নদীর ধারে। এই সব তীর্থস্থান দেখতে শুধু যে ধার্মিক লোকরা যায়, তাও নয়। সমস্ত ভারতবর্ষ

থেকে আর বিদেশেরও অনেক জায়গা থেকে ভ্রমণকারীরা কোথায় কি দ্রষ্টব্য আছে, তার খোঁজে আসে। যেখানেই দুটি বা আরো বেশি নদী এক সঙ্গে মেলে, সেখানেই তীর্থযাত্রীরা স্নান করতে আর পুজো দিতে জড়ো হয়। এই সমস্ত জায়গাকে অতি পবিত্র বলে মনে করা হয়। পৃথিবীতে যেখানে যত মহান পর্বত ও নদী আছে, তার মধ্যে আমাদের দেশের পাহাড় আর নদীর নাম করতে হয়। আমাদের পাহাড়ের মধ্যে এমন সব লুকনো জায়গা আছে, যা দেখলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সেখানে যায় শুধু বন-বিভাগের কর্মচারীরা, কাঠুরেরা, ভ্রমণ-কারীরা আর তীর্থযাত্রীরা।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যারা ভ্রমণ করে তাদের অনেকবার সিন্ধুনদীর উপনদীগুলিকে পার হতে হয়। কি আশ্চর্য ও সুন্দর দৃশ্যই না দেখে তারা। এই সব তীর্থস্থানের মধ্যে মণিমহেশের নাম কম লোকেই জানে। মণিমহেশ বলে অপূর্ব সুন্দর এক হ্রদ আছে, তারই ধারে মণিমহেশের পবিত্র শিখর। সেখানে পৌঁছতে হলে, যাত্রীদের ইরাবতী নদীর তীরে তীরে চলতে হয়। কাছেই ড্যালহাউসি নামের সুন্দর পাহাড়ী শহর। ড্যালহাউসি পাহাড়ের পায়ের কাছ দিয়ে ইরাবতী বয়ে যায়। এইখানেই বিখ্যাত চম্বা উপত্যকা। আরেকটু এগুলেই অপূর্ব সুন্দর কুলু ও কাংরা উপত্যকা। সেখানকার চমৎকার ফল আর অপরূপ শিল্প কর্মের কথা কে না জানে।

এরই কাছ দিয়ে বিপাশা বা বিয়েস নদীর নীল জল, ছোট ছোট ঢেউ তুলে, পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে। তার কুলকুল শব্দ গানের মতো শোনায়। কুলু থেকে অনেক যাত্রী বাসে করে সিমলা যায়। পথে পড়ে শতদ্রু বা সাটলেজ নদীর উদ্দাম ঘোলা স্রোত। তার উপরে সেতু আছে, পার হতে কোনো কষ্ট করতে হয় না।

ইরাবতী যখন পাহাড় থেকে নামে, তখন দুই পাশে পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপে ধাপে শস্য ক্ষেত পেরিয়ে আসে। হিমালয়ের তুষার শিখরের উপর দিয়ে যে কনকনে শীতের হাওয়া দেয়, তাতে আগন্তুকদের হাড় পর্যন্ত কেঁপে যায়।

মাঝে মাঝে মনে হয় পাহাড়ের সারি যেন দূরে সরে দাঁড়িয়েছে আর মাঝখানে দেখা যাচ্ছে চোখ জুড়নো সবুজ উপত্যকা। তার ধারে পাহাড়ের গায়ে গায়ে সুন্দর সুন্দর কুটির, বিশ্রামাগার, যাত্রী নিবাস পথিকদের চোখে পড়ে। বাড়ির চারদিকে কত ফুলের বাগান, ফলের বাগান। এসব জায়গায় হঠাৎ বৃষ্টি নামে। নদীর জল বেড়ে যায়; বিকট গর্জন করে জল নামে; সামনে যা পায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভয় পেয়ে, যাত্রীরা খ্যাপা স্রোতের কাছ থেকে যত দূরে পারে, আশ্রয় খোঁজে। তখন নদীর সে কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশা রূপ! গোটা বড় বড় গাছ উপড়িয়ে শিকড় সুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢালু গা ভেঙ্গে খসে সমস্তটা নিচে নেমে আসে। নদীর জলে পাথর আর রাশি রাশি মাটি পড়ে। পরিষ্কার নীল জল অমনি ঘোলা হয়ে, ফেনায় ভরে যায়।

পাথর ডুবে যায়; ঘুর্ণি-জল তৈরি হয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘাসের চাংড়া, কাঠ-কুটো, ডাল-পালা, ঝোপ-ঝাড়, হতভাগ্য জন্তু-জানোয়ারদের মৃত দেহ, উন্মত্ত স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসে। শুধু জানোয়ার কেন, সাবধান না হলে কত মানুষেরও প্রাণ যায়।

পাহাড়ের গায়ে নতুন নতুন ঝরণা তৈরি হয়, সদ্য তৈরি ছোট ছোট নদী হুড়মুড় করে এসে বড় নদীতে মেশে। বড় নদীর জল আরো বেড়ে যায়। তারপর হঠাৎ এক সময় নদীর জল বাড়তে বাড়তে দুই কূল ছাপিয়ে ওঠে। তার মানেই বন্যা। চারদিকে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে। কত ঘর-বাড়ি, গোয়াল, গোটা গোটা গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

বৃষ্টি থামলে এত অল্প সময়ের মধ্যেই নদীর জল নেমে যায় যে দেখে অবাক হতে হয়। স্রোতটাকে আবার স্বচ্ছ নীল দেখায়। বন্যার জল কিছু কিছু এখানে ওখানে আটকে থাকে। ঠিক মনে হয় পাথরের খাঁজে খাঁজে ছোট ছোট পুকুর তৈরি হয়েছে। পুকুরের জলে খুদে খুদে রুপোলি মাছ এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়। দুঃখের বিষয়, একটু পরেই সূর্য দেখা দেয়, পুকুরের জল শুকিয়ে যায়, মাছ বেচারিরা মরে যায়।

যে পথে যাত্রীরা যাতায়াত করে, কাদার জন্য, তার যা অবস্থা হয় সে আর বলবার নয়। কেউ যেতে পারে না। কাদা ছাড়া, বড় বড়

পাথর গড়িয়ে নামে, গাছ ভেঙ্গে পড়ে। অনেক সময় পাহাড়ের রাস্তাই হয় তো ভেঙ্গে নিচে পড়ে যায়। বন-বিভাগের চৌকিদাররা তখন খেয়াল রাখে কোথা দিয়ে কোন তীর্থযাত্রীর দল আসছে, তাদের সাবধান করে দিতে হবে। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তা মেরামত করা হয়, কোথাও বা খানিকটা নতুন রাস্তা তৈরি করতে হয়, যাতে যাত্রীদের অসুবিধা না হয়, বা তারা বিপদে না পড়ে।

এই প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'হাতিয়া'। এর ফলে তাদের খেত-খামার, গরু-মহিষ আর মানুষের প্রাণের এত ক্ষতি হয় যে হাতিয়াকে সবাই বড় ভয় করে। তবে সব কিছুরই একটা ভালো দিকও থাকে। হাতিয়ার বানে ভেসে আসা পলিমাটি আর পচা গাছ পাতা পড়ে, নদীর ধারের মাটি ভারি উর্বরা হয়।

মহানদী ও
ওড়িশার অন্যান্য নদ

উত্তর ভারতে চারটি বড় বড় নদী। তাছাড়া অনেক ছোট নদীও আছে, তবে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই, আগেই হোক বা পরেই হোক, এক সময় না এক সময়, বড় নদীগুলির একটার সঙ্গে মিলিত হয়। এই চারটি বড় নদী হল গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু আর মহানদী। তবে সিন্ধু নদীর মাত্র কয়েকটি উপনদী ভারতের মাটিতে প্রবাহিত। মহানদীকে সকলে ওড়িশার নদী বলে জানে। চার নদীর মধ্যে একমাত্র মহানদী-ই হিমালয়ে জন্ম না নিয়ে, মধ্য প্রদেশের বাস্তার অঞ্চলের গভীর জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের মাঝখানে মাটি থেকে উঠেছে।

লোকে বলে ভারতের সব চাইতে দরিদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে ওড়িশাকে ধরতে হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে হলে, ওড়িশার প্রাকৃতিক সম্পদ-গুলিকে যদি উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা যায়, ওড়িশা তা হলে আমাদের দেশের সব চাইতে ঐশ্বর্যশালী প্রদেশগুলির মধ্যে স্থান পাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধু যদি মহানদীর মোহানার উন্নতি করা যায় আর নদীটাকে নৌকো যাতায়াতের পক্ষে আরেকটু উপযুক্ত করে তোলা যায়, তা হলে ওখানকার অসমান পাহাড়ে জায়গার অসংখ্য খনিজ সম্পদ আর মূল্যবান ধাতুর আকরগুলো সহজেই নাগালের মধ্যে এসে পড়ে। তাছাড়া বিশাল মহীরুহের বনগুলিতেও পৌঁছনো যাবে আর ঐ সব খনিজ জিনিস আর কাঠ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ও বিদেশে চালান দেওয়া সম্ভব হবে। এখন যে রকম অবস্থা, চার দিকে দুর্গম বন জঙ্গল পাহাড় পাথর ইত্যাদির মধ্যে গাছপালা আর ধাতুর আকর এমনি পড়ে আছে।

কটকে মহানদী

গভীর হয়। ছোটনাগপুর আর সম্বলপুরের মাঝখানের এই পাহাড়ী অঞ্চলটি অপূর্ব সুন্দর।

নদী এই জঙ্গল আর বড় বড় পাথরে ভরা উঁচু-নিচু জমির মধ্যে দিয়ে পথ করে নেয়। তার দুই তীরে বুনো জানোয়ার আর হিংস্র আদিবাসীরা থাকে। বাইরের লোককে তারা শত্রু মনে করে।

পদমপুর বলে একটা জায়গায় এসে, মহানদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। পথে আরো বন-জঙ্গল, পাথুরে জমি পড়ে। তার উপর দিয়ে সম্বলপুর ছাড়িয়ে নদী সোনপুরের দিকে বয়ে যায়। ওড়িশার পাহাড়ের শ্রেণীর কাছে পৌছবার আগে নানান রঙের, নানান রকমের পাড়ি আর পাথর ভেদ করে এগুতে হয়। বড় কষ্টে মহানদী এই সব পাহাড় পর্বত পাথুরে জমি ভেদ করে অতি সুন্দর এক উপত্যকায় পৌছয়। তার দুই পাশের পাহাড়ের ঢাল ঘন বনে ঢাকা। স্রোত বড় প্রবল, থেকে থেকে জলপ্রপাত, কোথাও কোথাও তোড়ে জল ছোটে, এ নদী দিয়ে ষ্টীমার নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? তবে মাঝে মাঝে গ্রামের লোকরা নৌকো করে নদীর উৎপত্তির কাছাকাছি যায়। যেখানেই প্রপাত, ঘুর্ণি বা অন্য কোনো বাধা, সেখানেই মাঝিরা নৌকো থেকে নেমে তাকে টেনে বা কাঁধে করে নিয়ে যায়।

নদীতে অনেক মাছ, ওখানকার গ্রামবাসীরা রাশি রাশি মাছ ধরে। তা ছাড়া কুমীর আছে। কুমীর শিকারের এখানে ভারি সুবিধা, এজন্য জায়গাটার খুব নাম। কুমীরের চামড়ার অনেক দাম। কুমীর শিকারীদের এদিকে প্রায়ই আগমন হয়।

বর্ষাকালে মহানদী ভয়ঙ্কর সর্বনাশা রূপ ধরে। এই সব সরু উপত্যকা দিয়ে তখন ভীষণ গর্জন করে স্রোত ছোটে। অনেক জায়গা ডুবে যায়। এই নদীর কোনো উন্নতির চেষ্টা করা হয়নি, অথচ ভারতের সব নদীর মধ্যে এর জলরাশি পরিমাণে সব চাইতে বেশি। দুঃখের বিষয় জল বাড়ে শুধু বর্ষাকালে। শোনা যায় বানের সময় নারাজ গিরিখাতে প্রতি সেকেণ্ডে 1,17,000 ঘন মিটার জল বেরিয়ে যায়। অথচ গরমের সময়, তার জায়গায় সেকেণ্ডে মাত্র 40 ঘন মিটার জল যায়।

সরু উপত্যকাগুলোর আবহাওয়া বড় স্যাঁৎসেতে। এরকম আবহাওয়ায় বড় সুন্দর বাঁশ বন গজিয়ে ওঠে। কাগজের কলের কাঁচা উপকরণের মধ্যে বাঁশের দরকার হয়।

মহানদীর সবচেয়ে বড় উপনদী হল তেল। তারপর মহানদী অনেক চওড়া হয়ে, তালচেরের কয়লার খনির অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়। সম্ভবতঃ বহুকাল আগে এ সব জায়গা ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। পরে সে সব জঙ্গলের গাছ মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়ে, সময়ে চাপ খেয়ে কয়লায় পরিণত হয়েছিল।

আজ পর্যন্ত এখানে সুন্দর বনভূমি আছে। মৈকালা পাহাড়ের সারিতে যে সব বন দেখা যায়, সেখানে বিশাল বিশাল শাল, মহুয়া আর বাঁশ গাছ আছে। যারা একটু কষ্ট করতে ভয় পায় না, তাদের পক্ষে এমন জায়গায় ছুটি কাটানো হল স্বর্গবাসের সমান।

কটক শহরের সাত মাইল পশ্চিমে, নারাজে, মহানদী ওড়িশার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর স্রোত ক্রমে পূব দিকে বয়ে চলে। কত উপনদী এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়, কত শাখানদী বেরিয়ে যায়। যত সমুদ্র কাছে আসে, ততই শাখানদীর সংখ্যা বাড়ে। এইসব চওড়া নদীর দুই তীরে অনেকখানি বেলা-ভূমি ; তার একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে।

'কটক' মানে দুর্গ ; কটক শহর মহানদীর বুকে একটা দ্বীপের মতো জায়গায় অবস্থিত। নগরটি যেন একটা দুর্গ। মহানদীর আসল স্রোত ফল্‌স্ পয়েন্ট বলে একটা জায়গায় বঙ্গোপসাগরে পড়ে। এই জায়গাটার একটা ইতিহাস আছে। অনেক দিন থেকেই ওড়িশার শাসনকর্তারা বুঝতে পারছিলেন যে সমুদ্রতীরে একটা ভালো বন্দরের নিতান্ত প্রয়োজন। সেই বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ এসে লাগতে পারবে। তাতে চাল আর খণিজদ্রব্যের রপ্তানীর ভারি সুবিধা হবে। ওড়িশার সমুদ্রতীরে একেবারে হাতের কাছে একটা বড় বন্দর থাকলে, সেখানেই বড় বড় জাহাজ তাদের মাল তুলতে ও নামাতে পারবে। ব্যবসার কত উন্নতি হবে।

এদিকে ফল্‌স্ পয়েন্টের চারদিকে জলা-জঙ্গল, স্বাস্থ্য বড় মন্দ। কিন্তু ওড়িশার সব চাইতে বড় নদীর মোহানায় অবস্থান, এমন জায়গার

তুলনা কোথায়? কাজেই ওখানে একটা ভালো বন্দর তৈরির চেষ্টা চলতে লাগল। দেড়-শো বছর আগে একটা হার্বার বা পোতাশ্রয় তৈরি হল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 1815 সালে প্রচণ্ড ঝড়ে বন্দরটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। বহু লোক মারা গেল, অনেক সম্পত্তি নষ্ট হল, বন্দরের পরিকল্পনা ত্যাগ করা হল।

সম্প্রতি ফল্স্ পয়েন্টের কাছে পারাদীপ বলে একটা জায়গায় সমুদ্রের তীরে বন্দর তৈরি হচ্ছে। সকলের আশা হচ্ছে এই বন্দরটির কাজ সফল হবে। ভারত সরকারের সামনে ওড়িশা একটা চ্যালেঞ্জের মতো। যেন বলছে 'আমাকে নিয়ে কি করতে পার দেখি!' সব চাইতে গরীব রাজ্য থেকে, ওড়িশার সব চাইতে ধনী রাজ্যে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। এবং সমুদ্র তীর লম্বায় 400 কিলোমিটার। এই উপকূলে অনেক নদীর মুখ, অনেক মোহানা। সমস্ত ভারতের খনিজ সম্পদের অর্ধেক রয়েছে এখানে, অবশ্য তার অনেকখানি এখনো শুধু জমাই রয়েছে, সেখানে কোনো কাজ হয় নি।

মহানদী ছাড়া ওড়িশাতে আরো কয়েকটি ছোট নদী আছে। উত্তরে ঋষিকুল্য, বুড়াবালাঙ্গা আর স্বনামধন্য স্বুবর্ণরেখা। স্বুবর্ণরেখার স্রোতে ভেসে আসা বালিতে সোনার কণিকা পাওয়া যায়। গঞ্জাম আর কোরাপুট অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গোদাবরী নদীর কয়েকটি উপনদী বয়ে যায়। তার মধ্যে ইন্দ্রাবতী, কোলাব আর সিলেরুর নাম করা যেতে পারে। তাছাড়া ব্রাহ্মণী আর বৈতরণীও নাম করা নদী।

ওড়িশার নদীতে যখন বন্যা হয়, তখন ঐ সব অঞ্চলের যে কি মর্মান্তিক ক্ষতি হয় তা ভাষায় বলা যায় না। প্রত্যেক বছর বিশাল পরিমাণের জল নষ্ট হয়, সেই জল জমা করে রেখে, পরে কাজে লাগাবার নানা উপায়ের কথা নিয়ে সরকার চিন্তা করছেন। বর্ষাকালে যেমনি জলের প্রাচুর্য, শীত গ্রীষ্মে তেমনি খরা। সমস্ত ফসল শুকিয়ে যায়, প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

মহানদীর উপর হীরাকুদ বাঁধের পরিকল্পনা হয়েছিল 1945 সালে, এত দিনে সেটি বাস্তব রূপ নিয়েছে। টিকারপাড়ায় আরেকটা বাঁধের
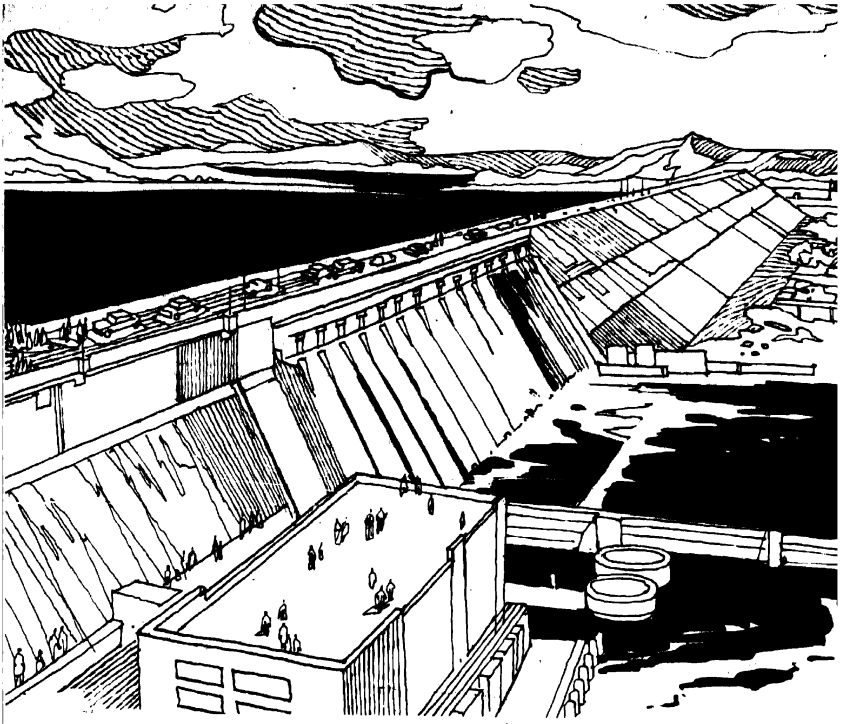
পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিছু খাল কাটা হয়েছে, কিছু পাড় বাঁধা হয়েছে, যাতে বন্যার জল খানিকটা বাধা পায়।

সম্বলপুর আর বোলানগির অঞ্চলের তেল ও মহানদীর অববাহিকা এবং ব্রাহ্মণী ও বৈতরণীর উপত্যকা আমাদের দেশের সব চাইতে উর্বরা জায়গার মধ্যে পড়ে। এই সব নদীর উপত্যকায় আর ওড়িশার পাহাড়ের মধ্যে অনেক অপূর্ব সুন্দর জায়গা আছে, যাদের কথা খুব কম লোকেই জানে, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক থেকে পৃথিবীর যে-কোনো বিখ্যাত সুন্দর জায়গার সঙ্গে তাদের তুলনা করা যায়। কবে লোকে এ সব জায়গা আবিষ্কার করবে, এদের উন্নতি করবে, তার-ই আশায় এরা যেন বসে আছে।

এক কালে এখানে ম্যালেরিয়ার বড় প্রকোপ ছিল। তা ছাড়া স্থানীয় লোকেরাও বাইরের লোকদের উপরে বেজায় চটা ছিল। আজকাল

অবশ্য এ সমস্তই ক্রমে বদলে যাচ্ছে। শিকারীরা এসে যেমন-তেমন করে গুলি চালিয়ে বন্য জন্তুর বংশের এত ক্ষতি করেছে যে আজকাল বন্য পশু সংরক্ষণের জন্য আইন করতে হয়েছে। জঙ্গলে ঢুকবার আগে শিকারীদের অনুমতিপত্র নিতে হয়। এ সব না করলে দেখতে দেখতে আমাদের দেশে বাঘ, ভাল্লুক, বুনো হাতির বংশ লোপ পেয়ে যাবে।

শিকারীরা ছাড়া আর যারা এই জঙ্গলে আসে, তাদের মধ্যে থাকে বন বিভাগের কর্মচারীরা আর খনির সন্ধানে যারা চারদিকে তদন্ত করে বেড়ায়; এদের কাজই হল যেখানে যেখানে নানা লক্ষণ দেখে, মাটির তলায় ধাতুর আকর থাকার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়, সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটা সিদ্ধান্তে আসা।

বুনো জানোয়ারের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হয়। জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, বুনো দাঁতালো শূওর আর বিষাক্ত সাপের অভাব নেই। কখনো হয়তো নিরাপত্তার জন্য খুঁটি পুঁতে, কিম্বা বড় বড় গাছের নিচের দিকের সুবিধামতো ডালপালা বেছে নিয়ে, তার উপর কুঁড়ে ঘর তৈরি করে নিতে হয়। অনেক সময় সারা রাত ধুনি জ্বেলে রাখতে হয়। লোকরা পালা করে ধুনি পাহারা দেয়, যাতে আগুন নিবে না যায়।

এই বনের মধ্যে, নদীর ধারে যারা অনেক দিন কাটিয়েছে, তাদের বই পড়া বিদ্যা প্রায় নেই বললেই হয়, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে আর যাকে বন বিদ্যা বলা যেতে পারে, অর্থাৎ জঙ্গল সম্বন্ধে বিশদ্ জ্ঞান, তাদের অগাধ।

এই রকম দেশের মধ্যে দিয়ে মহানদী সমুদ্র যাত্রা করে।

নদীতে এল বান

আগেই বলা হয়েছে, উত্তর ভারতে তিনটি বড় নদী আছে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র আর সিন্ধুনদীর খানিকটা। এই সব নদীর আবার অনেকগুলি উপনদী। এদের চেয়ে আরেকটু দক্ষিণে হল মহানদী। চারটি নদীর মধ্যে একমাত্র মহানদীর উৎপত্তি হিমালয়ের বুকে নয়।

এ সব নদী কখনো শুকোয় না। ইংরেজীতে এদের 'পেরেনিয়েল' বা চিরন্তন নদী বলে। তার কারণ এদের জল আসে পাহাড়ের বুকের চিরস্থায়ী উৎস থেকে। এরা যতই বয়ে চলে, অন্যান্য অনেক নদী এসে এদের সঙ্গে মেশে, ক্রমে নদী বিশাল আকার ধরে। তারপর বর্ষা আসে, কিম্বা হয়তো উৎসের কাছে উঁচু জায়গাগুলোতে বরফ গলে যায়, তাতে নদীর জল খুব বেড়ে যায়। তেমনি আবার শুকনো গরমের সময় জল কমে যায়।

পাহাড়ের গায়ে ঝরণা থেকে বুড়বুড় করে, স্ফটিকের মতো পরিষ্কার জল বেরিয়ে আসছে, এ দৃশ্য দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি চিত্তাকর্ষক। চারিদিকে পাথর, লতা-গুল্ম, ফার্ণ, তারই মাঝখানে মাটিতে একটা ফুটো। সেই ফুটো থেকে সমস্ত ক্ষণ জল বেরিয়ে, একটা ছোট নালার মতো হয়ে বয়ে চলে। অনেক সময়ই দেখা যায় কাছাকাছি এই রকম অনেকগুলি উৎস। উৎসের জল একটু দূর বয়ে গিয়ে, একসঙ্গে মিলে একটি ছোট নদী হয়ে, পাহাড় থেকে নামতে থাকে।

নদীর স্রোত কেমন করে নেমে আসে দেখতে ভারি ভালো লাগে। এত পাথর, এত বাধা, তবু নদী পথ করে নেয়। কখনো হয়তো পাথরকে

বেড় দিয়ে বয়ে যায় ; স্রোতের মাঝখানে পাথরটিকে মনে হয় ছোট একটী দ্বীপ। কখনো পাথর এড়িয়ে, তার পাশ দিয়ে চলে। পাথর যদি বেশি শক্ত না হয়, নদী পাথর কেটে নিজের পথ করে নেয়। একে ইংরেজীতে বলে 'এরোসন', অর্থাৎ অবক্ষয়। মহানদীতে এর অপূর্ব সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নানা জাতের পাথরের স্তর, তাই ভেদ করে স্রোত বয়ে চলেছে। যেমন করেই হোক, একা বা অন্য বড় নদীর সঙ্গে মিশে গিয়ে, দেশের সব নদী সমুদ্রের তীর অবধি পথ করে নেয়। সমুদ্র তীরে পৌছতে অনেক সময় তাদের হাজার মাইল কি আরো বেশি দূর যেতে হয়।

এই সব নিত্য স্রোতের নদী ছাড়াও আমাদের দেশে শত শত বানের নদী আছে। হঠাৎ প্রচণ্ড জলের স্রোত আসাকে বান ডাকা বলে। তার কারণ হয়তো হঠাৎ বৃষ্টিপাত, কিম্বা অন্য কিছু। ইংরেজীতে এই সব নদীকে বলে 'টরেন্‌সিয়েল' নদী।

আমাদের বানের নদীর মধ্যে কয়েকটি, যেমন দামোদর, বা মোর, বা অজয়, বহু যুগ থেকেই বিখ্যাত। এই সব নদী যেমন মাটির আর মানুষের অনেক উপকার করে, তেমনি আবার সাংঘাতিক সর্বনাশও করে। নদীর ধারে যারা জীবন কাটায়, নদীর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। এ রকম নদী ভারতের সব জায়গাতেই আছে।

খরার সময় নদী আর নদী থাকে না ; বালিতে ঢাকা অনেকখানি জায়গার মাঝখানে যেন সরু একটা নালা। নালাটা আবার মাঝে মাঝে জায়গা বদলায়। স্রোতটি খুব কম গভীর ; সব চেয়ে বেশি জল যেখানে, তাও এক হাঁটুর বেশি নয়। অন্য জায়গায় পায়ের কব্জি ডোবে কিনা সন্দেহ।

গরুর পাল নিয়ে রাখালরা নিশ্চিন্ত মনে জল ভেঙ্গে পার হয়ে যায়। গরুর গাড়ি, মোটর গাড়ি, পায়ে হেঁটে কত মানুষ দিব্যি এপার-ওপার করে। পরিষ্কার বালিতে ঝুড়ি ধামা নামিয়ে কত লোকে চড়ুই ভাতি করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করে।

কাজটা অবশ্য খুব ভালো নয়। মাঝে মাঝে যেখানে মজা করে এরা চড়ুই ভাতি করছে সেখানে পরিষ্কার শুকনো দিন হলেও, নদীর

গ্রামের লোক নদী পার হচ্ছে

আরো আগে হয়তো প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে গেল। হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, নদীর জল ভয়ঙ্কর বেড়ে যায়! কানে আসে একটা ধুপ-ধুপ শব্দ, যেন একশো ঘোড়া ছুটে আসছে। তারপর হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস। বালির উপর যারা আনন্দ করছিল, জন্তু-জানোয়ার যারা পার হচ্ছিল, তারা যদি দুদ্দাড় করে উঁচু পাড়ে উঠে পড়তে না পারে, তাহলে বানের জলে সবাই ভেসে যাবে।

বর্ষাকালে এই শান্ত সুন্দর নদীগুলো ভীষণ রূপ ধরে। সমস্ত বালির পাড় তখন ঘোলা জলে ঢেকে যায়। সে জলের কি প্রবল স্রোত! অনেক জায়গায় পাড় ভেসে যায়। দুই তীরের নিচু জমিতে যত শস্য বেড়ে উঠছিল, সব নষ্ট হয়। কত মানুষ জন্তু প্রাণ হারায়। যেসব নদীতে এ রকম বান ডাকে লোকে তাদের দুঃখের নদী বলে।

তবে বানের জলে কিছু উপকারও হয়। পলি মাটি স্রোতের সঙ্গে ভেসে এসে, এখানে ওখানে জমে থাকে। সেখানকার জমি তাতে আস্তে আস্তে উঁচু হতে থাকে। নিচু জমি থেকে উঁচু জমি সব দিক দিয়ে ভালো। তাছাড়া এসব জমি ভারি উর্বরা হয়।

এই সামান্য উপকার দিয়ে অবিশ্যি বন্যার সাংঘাতিক সর্বনাশের ক্ষতিপূরণ হয় না। তাছাড়া শুকনো সময়ে যে নদীর উপত্যকায় জলের অভাবে ফসল আর জন্তু মরে যায়, বর্ষাকালে সেই উপত্যকাতেই এত বেশি জল নষ্ট হয়, এটা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। আবহমান কাল থেকে নদীগুলো ইচ্ছা মতো আচরণ করেছে। কত মানুষ কত সম্পত্তি যে নদী গ্রাস করেছে, তার লেখা-জোখা নেই।

পশ্চিম বাংলায় অজয় নামে একটা নদী আছে। তার উৎপত্তি হল ছোটনাগপুরের মালভূমিতে। অজয় নামের মানেই হল যাকে পোষ মানানো যায় না। কত যুগ ধরে কবিরা অজয় নদীর সর্বনাশা রূপ সম্বন্ধে কবিতা আর গান লিখেছেন। আজ পর্যন্ত মাঝে মাঝেই অজয় নদীর ধারের বালি খুঁড়ে কত লোকে পুরনো নৌকোর অপূর্ব খোদাই করা ভাঙ্গা টুকরো খুঁজে পায়। কাঠের নৌকোর টুকরো এখন পাথরের মতো হয়ে গেছে। দুই হাজার বছরের কি তার বেশি পুরণো ধাতু দিয়ে তৈরি দেব-দেবীর মূর্তি আর বহুকাল আগে কোন ভুলে যাওয়া দুর্ঘটনায় যারা অজয় নদীর জলে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের ব্যবহার করা কত গহনা, বাসন-পত্র, এত দিন পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

এদিকে অজয়ের দুই তীরে কি সুন্দর সবুজ সব ধান ক্ষেত। তার মাঝখানে বীরভূমের উঁচু নিচু কর্কশ জমির উপর দিয়ে অজয় নদী বয়ে চলেছে। বীরভূমকে লোকে বলে বাংলা দেশের ভাতের হাঁড়ি। অজয় নদী পার হবার জন্য অনেক জায়গায় নৌকোর সেতু তৈরি করা হয়। বন্যার খবর পেলেই তাড়াতাড়ি মাঝিরা নৌকো তুলে, সেতু ভেঙ্গে দেয়। অনেক খরচ করে, কোথাও কোথাও রেলের পুল-ও তৈরি হয়েছে। অপূর্ব সুন্দর জায়গা, দিনে দিনে তার উন্নতি হচ্ছে। অথচ কিছু দিন আগে অবধি, থেকে থেকেই অজয় নদীতে বান

ডাকার ফলে শস্য নষ্ট হত, যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যাঘাত হত। তারপর ভারত সরকার এই সব অবাধ্য নদীকে পোষ মানাবার পরিকল্পনা করলেন, যাতে ভবিষ্যতে এ রকম সর্বনাশ আর না হয়। এই ধরণের নদীর মধ্যে অজয় হল একটি, তাও সবচেয়ে বড় নদীর মধ্যে গণ্য নয়।

দামোদর নদী অনেক দিনের পুরনো, এর ইতিহাসটি খুব চিত্তাকর্ষক। দামোদর উঠেছে বিহারের খামারপেট পাহাড়ে। ছোটনাগপুরের পাথুরে মালভূমির মাঝখানে এই নদীর জন্মস্থান। অনেকগুলি ছোট ছোট জলের ধারা এক সঙ্গে মিলে নদীর সৃষ্টি হয়েছে। দেখে মনে হয় যেন অনেকগুলো মুখওয়ালা একটা কাঁটা।

দামোদর আরেকটু এগিয়ে রূপনারায়ণের সঙ্গে মিশে যায়। এই মিলিত নদী যেখানে গিয়ে হুগলীতে পড়ে, সেখান থেকে বঙ্গোপসাগর মাত্র 112 কিলোমিটার দূরে। উৎস থেকে রূপনারায়ণের সঙ্গম অবধি দামোদর লম্বায় মাত্র 538 কিলোমিটার।

বরফ গলে দামোদরের সৃষ্টি হয়নি, কাজেই খরার সময় নদীর স্রোত একটা সরু নালার মতো হয়ে যায়। কিন্তু বর্ষার সময় কুখ্যাত দামোদরকে দেখতে হয়। এত ক্ষতি কম নদীই করেছে। অথচ এক সময় দামোদরে সে রকম বন্যা হত না। দামোদরের মোহানায় অনেক বড় লোকরা তখন বাগানবাড়ি করেছিলেন। দামোদরের শাখা নদীগুলির উপর অনেকগুলি বর্ধিষ্ণু শহর গড়ে উঠেছিল। এখানে নৌ-চলাচলের ভারি সুবিধা, একথা সকলে জানত; নদীর তীরে ব্যবসা বাণিজ্য গমগম করত।

পরে কিন্তু প্রায়ই বন্যা হতে আরম্ভ করল। মোহানায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেড়ে গেল। অনেকগুলি প্রাচীন শাখা নদী, যেমন বাঁকা, কুন্তী, পলি পড়ে বুজে এল। আগেকার সেই সমৃদ্ধি কোথায় অদৃশ্য হল।

আরো কয়েক পুরুষ ধরে মানুষ অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করার পর, তাদের খেয়াল হল তাদের দুঃখ ঘোচাবার হয়তো উপায় আছে। সরকারও বুঝলেন যে বন্যার জল সংযত করতে পারলেই দুর্ভিক্ষের

সম্ভাবনা কমবে আর বন্যার জল রোধ করা অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদিও স্বাধীনতা লাভ করার পর আমাদের দেশকে অনেক বিপদ ও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, এই সতর্কতার ফলে আজ অবধি তেমন গুরুতর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি।

পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের এই একটা বড় তফাৎ যে আমাদের দেশ হল কৃষিপ্রধান। ভালো ভাবে চাষবাস করতে হলে, সারা বছর ধরে যখন যেমন দরকার, জলের ব্যবস্থা চাই। সেই প্রাচীন কাল থেকেই দেখা গেছে যে আমাদের অনেক অঞ্চলেই বছরের মধ্যে কোনো সময় বেজায় বৃষ্টি পড়ে, আবার তার পরেই অতিশয় খরা দেখা দেয়। সকলেই জানত যে বর্ষার অতিরিক্ত জলটা যদি কোনো উপায়ে ধরে রেখে, খরার সময়ে কাজে লাগানো যায়, তা হলে সমস্যার সমাধান হয়। দুঃখের বিষয় কাজটা কি ভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে, তাও তাদের জানা ছিল না; তার জন্য যে-টাকা খরচ করতে হবে, তাও তাদের হাতে ছিল না। যেটুকু বিদ্যা তাদের ছিল, সেটুকুকে কাজে লাগাতে তারা চেষ্টা করত। বড় বড় বারো-মেসে নদী থেকে খাল কেটে তারা জল নিয়ে ক্ষেতের কাজে লাগাত। কিন্তু কাজটা বড়ই কঠিন, খরচও লাগত প্রচুর। তাছাড়া হাতে করে খাল কেটে কতদূর আর জল নেওয়া সম্ভব, বিশেষ করে যাদের অর্থবল নেই, তাদের পক্ষে?

বড় বড় পুকুর খোঁড়া হত। ছোট ছোট বাঁধ তৈরি করে জল আটকানো আর বন্যা ঠেকানোর চেষ্টা করা হত। কিন্তু দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে কিছু করা সম্ভব ছিল না। সকলেই জানত ওখানে বাড়িঘর করে, বারোমাস থাকার আয়োজন করা বিপজ্জনক। যথেষ্ট খনিজ পদার্থ ও কাঠ থাকা সত্ত্বেও সেখানে যেমন চাষ-বাস করা সম্ভব ছিল না, তেমনি কোনো শিল্প-কারখানাও তৈরি করা যেত না।

আজকের এই সব বড় বড় পরিকল্পনার প্রয়োজন, একটু একটু করে অনেক দিন থেকেই বেড়ে উঠছিল। এত কাল পরে তারা রূপ নিচ্ছে।

কল্পনা ও পরিকল্পনা

'প্ল্যান' আর 'প্রজেক্ট' বলে দুটি ইংরেজী কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। বাংলায় তাদের বলা যায় 'কল্পনা' আর 'পরিকল্পনা'। 'প্ল্যান' বলতে অনেকটা মানসিক বা লেখাপড়ার ব্যাপার বোঝায়। অর্থাৎ কোনো একটা বিশেষ কল্পনাকে বা উদ্দেশ্যকে কাজে পরিণত করবার উপায়, নিয়ম-কানুন, নক্সা ইত্যাদি। প্রজেক্ট বা পরিকল্পনা আরো কার্যকরী ব্যাপার। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হল ঐ সব উদ্ভাবিত উপায়কে বাস্তবে দাঁড় করানো। সাধারণতঃ দেখা যায় যেই না বাস্তব কাজ আরম্ভ করা যায়, অমনি অনেক অপ্রত্যাশিত অসুবিধার উদয় হয়।

স্বাধীনতা পাবার পর, অল্প দিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে আমাদের দেশে আর কিছু করার আগে প্রথমেই নদীগুলোকে শাসনের মধ্যে আনতে হবে। এর দুটি কারণ। প্রথমতঃ, আমাদের দেশটা বিশেষ করে চাষবাসের দেশ হলেও, এখানে এত প্রচুর পরিমাণে কাঁচা উপকরণ আর খনিজ সম্পদ আছে যে নানা রকম শিল্পের ব্যবস্থা ও উন্নয়ন না করলে অন্যায় হবে। এর জন্যে নিয়মিত জল সরবরাহ চাই।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ কৃষিকাজের উন্নতির জন্যেও সারা বছর যথেষ্ট জলের দরকার হয়। তা ছাড়া শিল্পের কারখানাতে যন্ত্র চালাবার জন্য আরো বেশি করে আর সস্তা দরে বৈদ্যুতিক শক্তি চাই। জল থেকেই বিদ্যুৎ আহরণ করতে হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে এই কাজের জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। তারপর পরিকল্পনা পাকা হলে আর সময় নষ্ট না করে, কাজও শুরু হয়ে গেল।

উত্তর ভারতে সবার আগে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, হীরাকুদ প্রজেক্ট আর ভাকরা-নঙ্গল প্রজেক্টের নাম করতে হয়। মহানদীর উপর হীরাকুদের বাঁধ 26 কিলোমিটার লম্বা। আজ অবধি পৃথিবীতে কোথাও এত লম্বা বাঁধ তৈরি হয় নি। ভাকরা-নঙ্গলের বাঁধ শতদ্রু নদীর উপরে।

সারা ভারতে এত বড় একক পাওয়ার-ষ্টেশন আর কোথাও নেই। তাছাড়া বিদেশী সহযোগিতা নিয়ে কি চমৎকার কাজ হতে পারে এ তারই নিদর্শন। ভাকরা-নঙ্গলের বাঁধ তৈরি করতে সোভিয়েট ইউনিয়ন আর আমেরিকা স্টেট্স্ উভয়ই আমাদের সাহায্য করেছেন। ভাকরা-নঙ্গলে সমান মাপের পাঁচটি হাইড্রো ইউনিট আছে। শেষেরটির কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ভাকরাতে, শতদ্রু নদীর উপরে 226 মিটার উঁচু একটা বাঁধ হয়েছে। এই বাঁধ দিল্লীর কুতুব মিনারের তিন গুণ উঁচু। পৃথিবীর সব চাইতে উঁচু বাঁধের মধ্যে এটি একটি।

ভাক্রা-নঙ্গল

নঙ্গলেও 29 মিটার উঁচু একটা বাঁধ আছে আর আছে এক 64 কিলো-মিটার লম্বা হাইডেল-চ্যানেল। ভাকরা, গাঙ্গুওয়াল আর কাটলাতে পাওয়ার-হাউস আছে। এর চারদিকে খাল আর তার শাখা জালির মতো অনেক হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এই পরিকল্পনাটি স্বাধীন ভারতের প্রধান কীর্তির মধ্যে একটি।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি জায়গায় পরিকল্পনা মতো কাজ হয়ে গেছে, বা এখনও হচ্ছে। গঙ্গার উপরে ফরাক্কা ব্যারাজ ও কোশী পরিকল্পনারও নাম করা উচিত। কোশী পরিকল্পনা যখন সম্পূর্ণ হবে, বিহার ও উত্তর প্রদেশের যথেষ্ট সুবিধা হবে। উত্তর প্রদেশের রিহাণ্ড পরিকল্পনা আর রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের চম্বল পরিকল্পনার কথাও মনে রাখা উচিত। চম্বল পরিকল্পনা থেকে বিহারও উপকার পাবে।

এ সব ছাড়া আরো ছোট ছোট পরিকল্পনাও আছে, যেমন বীরভূমের ময়ূরাক্ষী প্রজেক্ট। সকলেরই ঐ একই উদ্দেশ্য।

এই সব বাঁধ অনেকটা একই নিয়মে তৈরি করা হয়। নদীর এপার ওপার একটা মজবুত বাঁধ বা ইঁট আর কংক্রিটের দেয়াল গাঁথা হয়। জল যাওয়া-আসা ইচ্ছা মতো সংযত করবার জন্যে ঐ দেয়ালে কল-কব্জা লাগানো গেট থাকে, তাকে লক-গেট বলে। বর্ষা-কালে গেট বন্ধ থাকলে বাঁধের অন্য-পাশে হাজার হাজার মণ জল জমা হয়। ঐ জমানো জল পরে যেমন দরকার পড়ে, সেই অনুসারে লক-গেট খুলে ছেড়ে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ জল জমিয়ে রাখার জন্য, বাঁধের পাশে বড় বড় জলাশয় তৈরি করা হয়। কখনো কখনো আশে পাশের ছোট ছোট পাহাড় বা টিলা বা খাড়াই হয়তো জলাশয়ের দু-একটা দেয়ালের কাজ করে। বাকি ব্যবস্থা ইঁট, সুরকি, সিমেন্ট দিয়ে, যেখানে যেমন দরকার সেই ভাবে করতে হয়। অনেক সময় আগাগোড়া সব কাজই তৈরি করে নিয়ে একটা কৃত্রিম জলাশয় বানাতে হয়। জলাশয় থেকে খালের ভিতর দিয়ে জল নিতে হয়।

অনেক সময়ই দেখা যায় বাঁধের চারধারের জমি একটা দেখবার মতো জায়গা হয়ে উঠেছে। সুন্দর একটা বিশ্রাম-ঘর, ঘাস-জমি, ফুল-

:মাদর উপত্যকায় পরিকল্পনা:

বাগান আর নদী, বাঁধ জলাশয় আর খালের অপূর্ব দৃশ্য। কোনো স্বাভাবিক হ্রদের দৃশ্য এর চাইতে সুন্দর হয় কিনা সন্দেহ।

বড় বড় পরিকল্পনার কাজ থেকে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, তাতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে যত নগর ও গ্রাম আছে, সকলেরই কারখানার ও ঘরকন্নার সব চাহিদা মেটানো যায়। তাছাড়া প্রজেক্টের কাজে হাজার হাজার গরীব গ্রামবাসীর অন্ন সংস্থানও হয়, এটা খুব কম কথা নয়।

বর্ষার সময় নদীর অববাহিকা থেকে যে জল বয়ে চলে যেত, বাঁধ হওয়াতে সে জল ধরা পড়ে। এতে বন্যার সম্ভাবনাও কমে যায় আর জলও নষ্ট হয় না। খরার সময় এই জমানো জল দিয়ে চাষবাস ও অন্যান্য

কাজ হতে পারে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনও একটা বড় অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

শুকনোর সময় প্রজেক্টের কর্তৃপক্ষকে আরেকটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তখন বড় জলের চাহিদা। অথচ খুব বেশি জল ছাড়লে, জলাশয়ের গভীরতা বড় বেশি কমে যায়। তাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অসুবিধা হয়। আবার খুব কম জল ছাড়লে স্থানীয় লোকদের প্রয়োজন মেটে না। একে একে এই সব সমস্যারই একটা করে সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

আপাততঃ এই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে আজকাল অত বেশী বন্যা হয় না আর পরিকল্পনার কাজের এলাকার মধ্যে বন্যা হলেও সামান্যই হয়। আশা করা যায় যে এমন একদিন আসবে যখন আমাদের দেশের সমস্ত অবাধ্য নদীই শাসন মানবে।
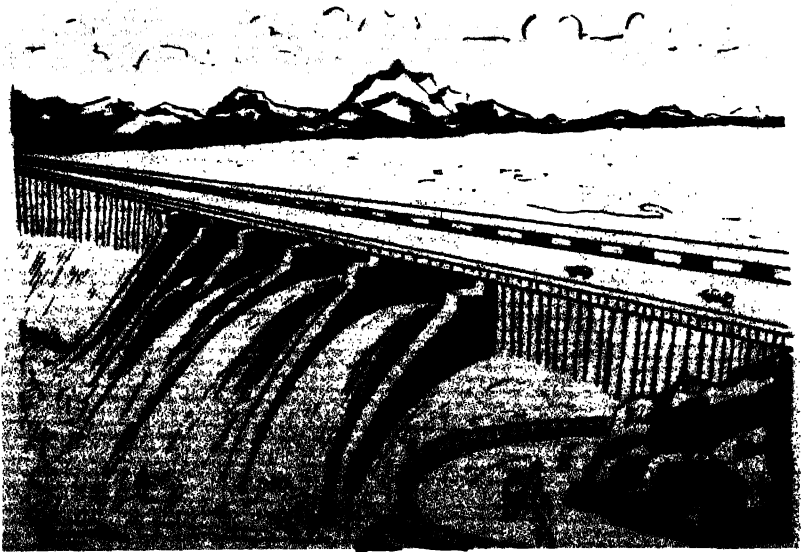
নদী আর নদীর মানুষ

অনেক বছর আগে একবার শান্তিনিকেতনের কাছে মিষ্টি নদী কোপাইয়ের ধারে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিলাম। কোপাই বড় নদী নয়; ছোট একটা স্রোত, দুদিকে হলদে বালির তীরের মাঝখান দিয়ে নুড়ি-পাথরের উপর দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে। কোপাইয়ের জল এত পরিষ্কার যে নুড়ি-ছড়ানো তলার মাটি দেখা যায়। সবুজ শ্যাওলা নড়ে চড়ে; খুদে খুদে মাছ সাঁতরিয়ে বেড়ায়।

হঠাৎ দূর থেকে আনন্দ কোলাহল শুনতে পেলাম। তার পরেই অবাক হয়ে দেখলাম মস্ত এক দল মেয়ে পুরুষ ছোট ছোট ছেলেপিলে নদীর জল ঠেলে উজানে হেঁটে আসছে। কেউ জলের মধ্যে হাঁটছে। কোথাও হাঁটু জল, যেখানে জল গভীর সেখানেও কোমর পৌঁছয় না। কেউ বা ডাঙ্গায়।

কাছে এলে দেখলাম ওরা স্থানীয় আদিবাসী। সবাই ভিজে চুপ্পুড় আর সকলের গালভরা হাসি। দলের যুবকরা আর একটু বড় বড় ছেলেরা নদীর জলে হাঁটছে। তখন যদিও বেশ স্রোত। প্রত্যেকের হাতে দেখলাম মাছ ধরার সরঞ্জাম, জাল, খ্যাপলা জাল, তারের ছাকনি, ফুটো বালতি, বড় একটা ছ্যাদা-ওয়ালা ঝুড়ি। ঐ ঝুড়িকে পোলো বলে; ঐ দিয়ে খুব সহজে মাঝারি মাপের মাছ ধরা যায়। জলের মধ্যে এক ঝাঁক মাছ দেখলেই ঘপাং করে তার উপর পোলো চেপে ধরতে হয়। কয়েকটা মাছ ভিতরে আটকা পড়ে যায়। তখন ফুটো দিয়ে হাত গলিয়ে একটা একটা করে কিল-বিলে মাছ বের করে আনতে হয়।

শান্ত কোপাই

যারা নদীর ধারে ধারে হেঁটে আসছিল, তাদের মধ্যে দেখলাম বুড়োরা, কচি ছেলেপিলেরা আর ছোট বড় মেয়েরা সবাই। নদীতে যারা ছিল, তাদের সঙ্গে সঙ্গে এরাও এগুচ্ছিল। যত মাছ ধরা পড়ছিল তার প্রত্যেকটিকে হয় এ তীরের নয় ও-তীরের বালির উপর ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছিল। সেই তীরে যারা ছিল, তারা অমনি খপ করে মাছটি ধরে, তার পেট চিরে নিয়ে প্রকাণ্ড একটা ঝুড়িতে ফেলছিল। ডাঙ্গার লোকরা ঐ রকম বড় বড় অনেকগুলো ঝুড়ি মাথায় নিয়ে চলছিল।

বড় বড় ছেলে মেয়েদের হাতে বর্শা আর বেঁটে লাঠি ছিল। তাই

দিয়ে তারা নদীর পাড়ের ঝোপ-ঝাপে খোঁচা দিচ্ছিল। খানিক বাদে বাদেই খোঁচার ফলে বেশ বড় বড় চিংড়িমাছ বেরিয়ে আসছিল।

নদীর জল ঘোলা হয়ে উঠছিল; ওরা দলবলে হাসতে হাসতে চ্যাচাতে চ্যাঁচাতে উজান ঠেলে আরো এগিয়ে গেল। এক বুড়ি একটু পিছিয়ে পড়েছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলল ওরা সবাই নদীর ধারের একই গাঁয়ের লোক। বলতে গেলে, বেজায় পঙ্গু বুড়োরা আর রুগীরা ছাড়া, গাঁ সুদ্ধ সকলে আজ বেরিয়ে পড়েছে। কোলের খোকা খুকিদের পর্যন্ত রেখে যায় নি। আজ তাদের মাছ ধরার উৎসব। বছরের মধ্যে কয়েকবার এমনি হয়।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত মাছ দিয়ে তোমরা কি করবে?' শুনে বুড়ি তো অবাক। 'সে কি! গাঁ সুদ্ধ সবাই খাবে। সারা দিন ধরে যত মাছ পাওয়া যাবে, বিকেলে সব মোড়লের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া

পোলো দিয়ে মাছ ধরা

হবে। কার বাড়িতে কত লোক, কত মাছ দরকার, সব হিসাব করে মোড়ল মাছ ভাগ করে দেবে। কেউ বাদ পড়বে না, কেউ বেশি বেশি পাবে না। আমরা সবাই যে কোপাইয়ের ধারের মানুষ।' এই বলে বুড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেল, দলকে ধরতে হবে। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু ঘটনাটা ভুলবার মতো নয়।

বছর দশেক আগে একবার বিদ্যাধরী নদীতে নৌকো করে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এককালে এই বিদ্যাধরী গঙ্গারই একটা গভীর শাখা ছিল।

আমরা যখন গিয়েছিলাম, বিদ্যাধরী তখন নামেমাত্র নদী। পলিতে এমনি ভরে গেছে যে স্রোত বলে কিছু বোঝা যায় না। গঙ্গা থেকে একটি খাল কেটে, তাতেই নৌকো যাওয়া-আসা করে।

যে সব জেলেদের পূর্বপুরুষরা সেই যখন এখানে ঘন ঘন আর বাঘের উপদ্রব ছিল তখন থেকে বিদ্যাধরীর ধারে বাস করেছিল, তারা এখন একটা সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে। আমরা আসলে ঐ সমবায় সমিতির মাছের চাষ দেখতেই গিয়েছিলাম।

দেখলাম নতুন সব অপিস-বাড়ি উঠেছে ; তার গা ঘেঁষে পুরনো কুঁড়েগুলোও রয়েছে। একটা প্রাচীন মন্দিরও দেখলাম। মন্দিরে বিগ্রহ নেই। শুনলাম এইটাই সুন্দর রায়ের মন্দির। সুন্দর রায় বাঘের দেবতা ; মানুষদের তিনিই রক্ষা করেন। এ সব জায়গাই বাঘের আড়ৎ ছিল।

মাছের চাষের ব্যবস্থা খুবই ভালো। মাছ পালার জন্য দেখলাম অনেক বুদ্ধি করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মাছের বাচ্চাদের থাকবার জায়গা বাঁধ দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। নতুন ডিম থেকে ফুটে বেরুনো পোনা থেকে একেবারে বড় হওয়া পর্যন্ত যা যা দরকার, সবই করা হয়েছে। ছোট মাছ কাউকে ধরতে দেওয়া হয় না।

মে মাস। দিনটা পরিষ্কার হলেও সেদিন বাতাস খুব চঞ্চল ছিল, মনে হচ্ছিল একটু পরেই হয়তো ঝড় উঠবে। লম্বা লম্বা মাছ ধরার ছিপে করে যখন আমরা চাষ দেখতে বেরুলাম, তখন লক্ষ্য করলাম যে শুধু বাতাস নয়, মাছের ছানারাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা জল ছেড়ে চার পাঁচ হাত উপরে অবধি লাফিয়ে উঠছিল।
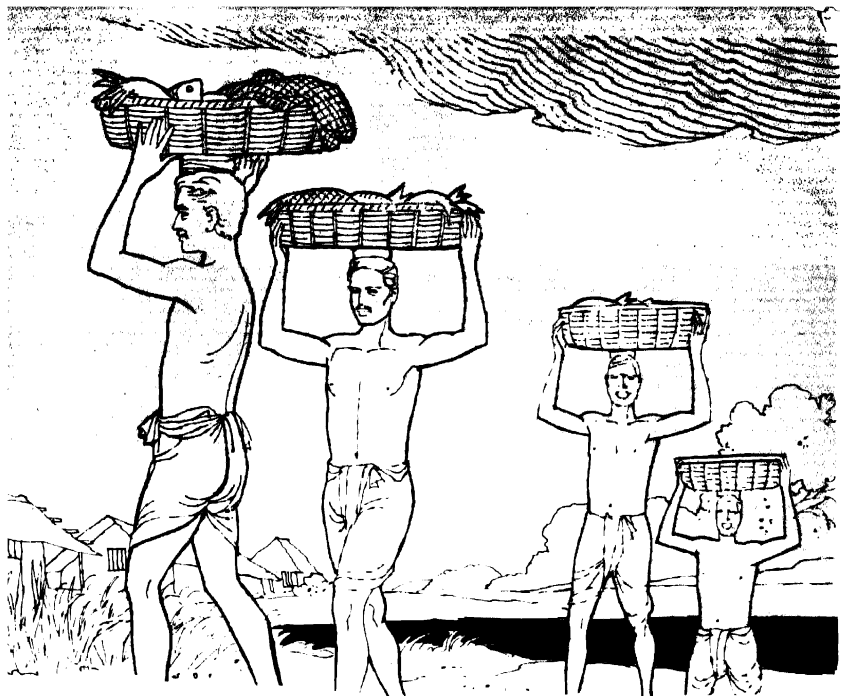
জেলেরা মাছের ঝুড়ি নিয়ে চলেছে

বাঁধের কাছে পৌঁছলে, নৌকো টেনে বাঁধ পার হতে হচ্ছিল। নৌকো হাল্কা করার জন্য আমরা কেউ কেউ নেমে হাঁটু জলে দাঁড়াচ্ছিলাম। যেখানে জল সব চাইতে গভীর, অবশেষে সেখানে এলাম। এখানে চার পাঁচ কিলোর বড় বড় মাছরা থাকে।

এখানে দেখলাম ছোট ছোট দ্বীপে কয়েকটা করে কুঁড়ে ঘর। মাঝিরা কেউ কেউ এখানে থাকে। দেখলাম রোদে তারা জাল মেলে দিয়েছে, শুকোবার জন্য। সব কিছু তকতকে ঝকঝকে। সবাইকে দেখে মনে হয় বড় সুখী। এই তাদের নিজেদের মাছের ব্যবসা ; এই সমিতির তারা সবাই ভাগীদার। এইভাবেই তাদের পূর্ব-পুরুষরাও জীবন কাটিয়েছে। খুসি হবে না-ই বা কেন ?

তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগল একটা দ্বীপে একটু বসতে। মাটির

ভাঁড়ে করে গুড় দিয়ে চা এনে দিল, তাজা তাজা মাছ ভাজা দিল। ইচ্ছা না থাকলেও, তার পরেই আমাদের ফিরতে হল।

ভারতের সব জায়গায় এই রকম ছোট ছোট নদী-নালা আছে। কি সুন্দর নাম তাদের ; কপোতাক্ষী, তার মানে যার পায়রার মতো চোখ ; ইচ্ছামতী, স্বপ্ন যেখানে সত্যি হয়। এ-সব নদী আমাদের জীবন থেকে আলাদা কিছু নয়। আমাদের দেশের লোকরা যুগ যুগ ধরে, বাপের পর ছেলে তারপর তার ছেলে, এই সব নদীর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখেছে। ঐ নদীতে এরা স্নান করেছে, জল পান করেছে, ঘটি ভরে জল নিয়ে বাড়ি গিয়ে উনুনের পাশে, ঠাকুর-পুজোর বেদীর পাশে যত্ন করে নামিয়ে রেখেছে। ঐ নদী ওদের প্রাণ।